প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৬

মুদ্রাকর :
শ্রীঅজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

তিনটি এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী

জুল ভর্ণের তিনটি বিখ্যাত উপন্যাস একত্রে

ফাইভ উইকস্ ইন এ বেলুন

টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগ আণ্ডার দি সী

রাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ

জুল ভর্ণ

উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে একদিন ফরাসী শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন বিশালকায় লাল দাড়ি গোঁফ সমন্বিত এক ব্যক্তি। তাঁর ভিজিটিং কার্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করার সঙ্গে সঙ্গে অফিস রিসেপ্‌সনিস্ট ছেলেটির মুখ উল্লাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

একটা চেয়ার ভদ্রলোকের দিকে সসম্ভ্রমে ঠেলে দিয়ে ছেলেটি বলে ওঠে, মসিয়ে ভর্ণ অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুণ। উঃ এত দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করে আপনি নিশ্চয়ই খুবই ক্লান্ত।

লেখক জুল ভর্ণ-এর এতদিনে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা। তিনি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছেন বহুবার—একবার তো আশি দিনে মাত্র। তিনি সমুদ্রতলে ষাট হাজার মাইল ঘুরেছেন, গিয়েছেন চন্দ্রে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে অভিযান চালিয়েছেন। তিনি আফ্রিকার নরখাদকদের সঙ্গে আলাপ করেছেন, এবং অরিশকোর রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গেও মুলাকাৎ করেছেন, বিশ্বের ভূগোলের হেন স্থান কমই আছে যেখানে না পদার্পণ করেছেন লেখক জুল ভর্ণ।

কিন্তু শুনলে তাজ্জব মনে হয়, মানুষ জুল ভর্ণ চিরদিনই ঘর-কুনো। তাকে যদি ক্লান্ত দেখায় তারজন্য দায়ী তার একাসনে বসে দিনের পর দিন লেখন কার্য। টানা চল্লিশ বছর ধরে তিনি লাল ইটওয়ালা টাওয়ার সদৃশ এক ঘরে বসে ছ'মাসে একখানা অর্থাৎ বছরে দু'খানা করে গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

এই মহান লেখকের তদানিন্তন কল্পনা আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের মারফৎ। রেডিও আবিষ্কারের আগেই তিনি টেলিভিসনের কল্পনা করে গিয়েছেন। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন ফোনো-টেলিফটো। রাইট ভ্রাতাদ্বয়ের উড্ডয়নের অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি হেলিকপ্টারের কল্পনা করে গিয়েছেন। আজ

বিংশ শতাব্দীতে যা দেখছি সবই তিনি এক শতাব্দী আগে রচনায় আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করে গেছেন। সাবমেরিণ, এরোপ্লেন, নিয়ন আলো, চলন্ত সিঁড়ি, শীততাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, আকাশচুম্বী অট্টালিকা, গাইডেড মিসিলি, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি কল্পনা করে গিয়েছিলেন এই মহান লেখক, শুধুমাত্র কল্পনা নয় এইসব বস্তুকে এমন নিখুঁতভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন যে জ্ঞানীগুণী বিজ্ঞানীরা কাগজ কলম নিয়ে বসে ওঁর তথ্যাদি চেক করে কোন ভুল তথ্য বের করতে সমর্থ হয়নি। পরবর্তীকালে যেসব বিজ্ঞানী, আবিষ্কারক ও অভিযানকারী জুল ভর্ণ-এর কল্পনার দ্বারা উপকৃত হয়েছিলেন তারা হলেন নর্থপোল-এর ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া অ্যাডমিরাল বাইর্ড। প্রখ্যাত নৌস্থপতি সাইমন লেক। বেলুনবিদ ও গভীর সমুদ্র অভিযানকারী অগাস্টে পিকার্ড। বেতার উদ্ভাবক মার্কনি।

সুখের কথা তার কল্পনাশক্তির ফসল তিনি নিজ চক্ষে দেখে গেছেন। একজন মানুষ যা কল্পনা করতে পারে, অপর কোন মানুষ তা বাস্তবে পরিণত করতে নিশ্চয়ই সমর্থ হয়, এই ছিল তার অভিমত।

১৮২৮ খৃস্টাব্দে জুল ভর্ণ যখন ফরাসী দেশের নাণ্টে নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন তখন নেপোলিয়ান সবেমাত্র মারা গিয়েছেন, প্রথম রেলপথের বয়েস পাঁচ বছর, অতলান্তিক মহাসাগর পাড়ি দিচ্ছে বাষ্পীয় ইঞ্জিনওয়ালা জাহাজ, যদিও তাদের অঙ্গে তখনও পাল-মাস্তুল প্রভৃতি বিদ্যমান।

বাপের ইচ্ছেয় তিনি প্যারিসে আসেন আইন পড়তে আঠারো বছর বয়সে। কিন্তু আইনের চেয়ে কবিতা ও নাটক লেখার দিকে তাঁর সমধিক ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়।

একদা এক সন্ধ্যায় কোন অভিজাত সম্প্রদায়ের এক আনন্দানুষ্ঠানে তরতরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ধাক্কা খেলেন বলিষ্ঠ এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। থ্রি মাস্কেটিয়ার্স-এর অমর গ্রন্থকারের সঙ্গে এই ভাবেই পরিচয়ের সূত্রপাত। আলেকজাণ্ডার ডুমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে জুল

ভর্ণ-এর মনে লেখক হওয়ার প্রবল বাসনার জন্মলাভ হয়। দুজনে যুগ্মভাবে একটি নাটকও লেখেন এবং সেটি সাফল্য সহকারে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীতও হয়। প্রখ্যাত লেখকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি স্থির করেন যে ইতিহাস নিয়ে ডুমা যে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন তার উপন্যাসাদিতে জুল ভর্ণ-ও তেমনি ভূগোলের যাদু খেলা দেখাবেন তার বই-এ।

তাঁর প্রথম বই ফাইভ উইকস্ ইন এ বেলুন পরপর পনের জন পাব্লিশারের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় রেগেমেগে তিনি এর পাণ্ডুলিপি অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। ভাগ্যিস তাঁর স্ত্রী তৎক্ষণাৎ সেটা বাঁচিয়ে দিলেন নয়তো পৃথিবী একটি অপূর্ব গ্রন্থ থেকে বঞ্চিত হত।

এ বই সর্বাধিক বিক্রিত হয়। সভ্য সমাজের যাবতীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রশংসা অর্জন করে। চৌত্রিশ বছর বয়সেই এর গ্রন্থকার প্রখ্যাত হয়ে যান। এরপর একটি চুক্তির সৌজন্যে বছরে দু'খানা করে বই টানা চল্লিশ বছর ধরে লিখে যান।

সুয়েজ ক্যানেল স্রষ্টা ফার্ডিনাণ্ড দ্য লেসেপস এত বেশী ভক্ত হয়ে পড়েন ভর্ণ-এর যে তিনি লেখককে লিজিয়ান অফ হনার সম্মানে ভূষিত করবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন।

জুল ভর্ণ প্যারিস থেকে আমিয়েন্স-এ চলে এসে এমন একটি বাড়ি করেন যার টাওয়ার-এর উপর জাহাজ ক্যাপ্টেনের কেবিনের মত একটি ঘর তৈরী হয়। এই ঘরের দেওয়াল ও মেঝে পূর্ণ ছিল বিশ্বের তাবৎ দেশের মানচিত্র ও সেই সেই দেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ সহ বিভিন্ন পুস্তকাবলী। এখানেই তিনি জীবনের শেষ চল্লিশটি বছর অতিবাহিত করেন।

রাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ বইটি যখন প্যারিসের লে টেম্প্স্ পত্রিকায় ধারাবাহিক বের হচ্ছিল, সারা পৃথিবীর পাঠকদের মধ্যে সেকি চাঞ্চল্য। এ বইয়ের নায়ক কাল্পনিক ফিলিয়াস ফগ্-কে পরাজিত করবার জন্য ১৮৮৯ এ নিউ ইয়র্ক-এর এক সংবাদপত্র নেলি

ব্লাই নামে এক মেয়ে সাংবাদিককে পৃথিবী প্রদক্ষিণে পাঠায়। মেয়েটি ৭২ দিনে প্রদক্ষিণ করে। পরে অবশ্য ভর্ণ-এর ভবিষ্যৎবানী মত ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ তৈরী হতে একজন ফরাসী ভদ্রলোক ৪৩ দিনে পৃথিবী ঘুরে আসেন।

টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগ আণ্ডার দি সি-তে নটিলাস নামে যে সাবমেরিনটি তিনি কল্পনা করে গিয়েছিলেন তা শুধু ইলেকট্রিকে যে চালিত হত তা নয় সমুদ্র জল থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম ছিল। শুনলে অবাক লাগে এই সেদিন মাত্র দুজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী উক্ত কাজটি করতে সক্ষম হয়েছেন। আর ঐ কাল্পনিক 'নটিলাসে'র মত নিরবধি কাল জলতলে ডুবে থাকবার ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে সেদিনের যুক্তরাষ্ট্রে'র পরমাণু শক্তি চালিত সাবমেরিন 'নটিলাস'।

জুল ভর্ণ-এর শেষ জীবন আদৌ সুখের ছিল না। বুদ্ধিজীবী তাদের বিদ্রূপের পাত্র হয়ে উঠেছিলেন তিনি। নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে দৃষ্টি শক্তি যায়, বধিরতাও ক্রমে এসে গ্রাস করে।

১৯০৫ এ এই প্রখ্যাত লেখকের মৃত্যু হয়। তাঁর শোক যাত্রায় দেশের যাবতীয় জ্ঞানীগুণী আর সারা বিশ্বের রাজা রাজড়াদের, প্রেসিডেন্টদের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন।

প্যারিসের একটি দৈনিকপত্রই বুঝি জুল ভর্ণ-এর মৃত্যু সংবাদকে সর্বাধিক প্রশংসা বাক্যে প্রকাশ করে ঃ

The old storyteller is dead. It is like the passing of Santa Claus.

পরিশেষে বক্তব্য, আসল গ্রন্থগুলি বৃহৎ, এ গ্রন্থে গ্রথিত হল সেগুলির সবিশেষ সংক্ষিপ্ত রূপ। সংক্ষেপ করা হলেও মূলের রস যাতে বজায় থাকে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

বড় হয়ে কিশোর পাঠক-পাঠিকা যাতে মূল গ্রন্থ পাঠ করে রসাস্বাদনে আগ্রহী হয় সেই কথা মনে রেখেই এই প্রচেষ্টায় তারা খুশী হলেই সম্পাদকের শ্রম সার্থক হবে।

ফাইভ উইক্‌স্ ইন এ বেলুন

ইংল্যাণ্ডে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী রয়েল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটির একটি সভায় সভাপতি স্যার ফ্রান্সিস এম—বলেন :

ইংল্যাণ্ড এবার তার এক সুযোগ্য সন্তান ডাক্তার স্যামুয়েল ফার্গুসানের জন্য গর্বিত। কেননা তিনি যে অভাবনীয় অভিযান করতে যাচ্ছেন তা সাফল্যমণ্ডিত হলে আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ অনাবিষ্কৃত স্থান মানচিত্রের শোভাবর্ধন করবে।

ডাঃ স্যামুয়েল ফার্গুসন আফ্রিকা পাড়ি দেবেন গাড়িতে বা পায়ে হেঁটে নয়। এক অভিনব পদ্ধতিতে অর্থাৎ বেলুনে চেপে।

উক্ত সভায় প্রায় ১৫০০ পাউণ্ড সংগৃহীত হল ডাঃ ফার্গুসনের হাতে দেবার জন্য।

এই অভিযানকারীর বয়েস চল্লিশ। সপ্রতিভ বলিষ্ঠ চেহারা। সর্বদা কিছু না কিছু আবিষ্কারের নেশায় মশগুল।

বাবা ছিলেন সওদাগরী জাহাজের ক্যাপ্টেন। ছেলেবেলা থেকেই তার কাছে মাঙ্গোপার্ক, ব্রুস, লেভাইল্যাণ্ট, সেলকার্ক, রবিনসনক্রুশো প্রভৃতি চরিত্রগুলি আদর্শ স্বরূপ ছিল। বাপের সৌজন্যে পৃথিবীর বহুদেশ ভ্রমণ করে এসেছিলন।

পিতার মৃত্যুর পর ফার্গুসন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্স নামক সৈন্যদলে যোগদান করে ভারতবর্ষে আসে। চাকরী ভাল লাগেনি। তাই চাকরী ছেড়ে কলকাতা থেকে পায়ে হেঁটে উত্তর ভারতের দিকে রওনা হয়। কখনো শিকার কখনো বা উদ্ভিদ বিদ্যার অনুশীলন করতে করতে একদা সুরাটে উপস্থিত হয়। সুরাট থেকে যায় অষ্ট্রেলিয়া। অবশেষে স্বদেশে।

বিভিন্ন রকম আবহাওয়া ও পরিশ্রমে অভ্যস্ত এই অভিযানকারী যে কোন স্থানে বাস, যে কোন খাদ্য গ্রহণ বা যে কোন স্থানে শয়ন অভ্যেস করে ফেলেছিল। দিনের পর দিন যখন তখন ঘুমনো বা রাত্রির যে কোন সময় উঠে পড়া তার অভ্যাসগত হয়ে গিয়েছিল।

সভার পরদিন কাগজে বের হল :

এবার আফ্রিকা মহাদেশের বহু অজ্ঞাত রহস্যের উদঘাটন হবে। ইতিপূর্বে ডাক্তার বার্থ সুদান পর্যন্ত ডাঃ লিভিংস্টোন উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে জামবেজি পর্যন্ত আর বার্টন ও স্পোর্ট গ্রেট ইনল্যাণ্ড লেক অঞ্চল অবধি গিয়ে আফ্রিকার অভ্যন্তরে তিনটি পথ খুলে দিয়েছিল। এই ত্রিবিধ পথের সংযোগস্থলে আজ পর্যন্ত কেউ যেতে পারে নি। এবার বোধ করি সেই সুসম্ভব কার্য সম্ভব হতে চললো ডাঃ সামুয়েল ফার্গুসনের দ্বারা।

এই অভিযানে অংশ গ্রহণের জন্য ডাক্তারের কাছে বহু অনুরোধ আসতে লাগলো। ডাক্তার কাউকেই আমল দিলেন না।

ডাক্তারের একজন অদ্ভুত বন্ধু ছিল। তার নাম ডিক কেনেডি। স্কটল্যাণ্ডবাসী ডিক জাতে জেলে, পেশায় শিকারী। বন্দুক রাইফেলে তার অদ্ভুত হাত। হাতে অসম্ভব টিপ, শরীরে শক্তিও ছিল দানবের মত। ভয় বলে কোন বস্তু ছিল না তাব।

ফার্গুসনের এই অভিযানের ঘোরাঘুরি বাই ডিক দু'চোখে দেখতে পারত না। ডাক্তারকে সে নানাভাবে এই পাগলামী থেকে নিরস্ত করতে চেষ্টাও করেছে কিন্তু সফল হয় নি।

এবারও সে চেষ্টা করল কিন্তু ফল যথাপূর্বং। বরং তাকেও সঙ্গে যেতে রাজি করালো ডাক্তার।

—বেশ তো যদি যেতেই হয়, ডিক বলে, তাহলে ঐ সব বেলুন-ফেলুনে কেন বাবা। তার চেয়ে হাঁটা পথে চলো না কেন?

ডাক্তার ফারগুসন-এর জবাবে জানালো যে হাঁটা পথ বিপদসঙ্কুল। বহু অভিযানকারী ইতিপূর্বে জন্তু-জানোয়ার, রোগ-শোক, পথশ্রম

আর নর-খাদক মানুষদের হাতে মারা পড়েছে। বেলুনে যাওয়া মানে এই সব বিপদ-আপদের নাগালের বাইরে এবং বহু উর্ধ দিয়ে যাওয়া। হাঁটা পথে যা মাসের পথ বেলুনে তা মাত্র দু'চার দিনের পথ। অক্লেশে পথ-প্রান্তর, দুর্ভেদ্য বন, পাহাড় পর্বত নদীনালা অসুখ বিসুখ বিষাক্ত আবহাওয়া সব কিছুর নাগালের বাইরে দিয়ে নিরাপদে চলে যাওয়া এক বেলুনে চড়েই সম্ভব। উপর থেকে সব কিছু দৃশ্য সুন্দর ভাবে দেখা যাবে।

—কিন্তু বন্ধু, বেলুন তোমার মনোমত পথে চলবে কি করে ডিক প্রশ্ন করে।

—সে ব্যবস্থাও আমি ঠিক করেছি, ডাক্তার বলে, আমরা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে বয়ে যাওয়া 'ট্রেডউইণ্ডের' সাহায্য পাব। সে বাতাসই আমাদের গন্তব্য পথে যেতে সাহায্য করবে।

জাঞ্জিবার দ্বীপ থেকে যাত্রা শুরু হবে স্থির হয়েছিল। দুটি বেলুন যাবে। ডিক ছাড়া সঙ্গে যাবে ডাক্তারের চিরসাথী চির বিশ্বস্ত অনুচর ভৃত্য জো। খাদ্য পানীয় যন্ত্রপাতি পোষাক-আশাক মিলিয়ে ৪০০০ পাউণ্ড ওজন বহন করবার ক্ষমতা আছে বেলুন দুটির।

বড় বেলুনের মধ্যে থাকবে ছোট বেলুন। দুটি বেলুনই তৈরী হল টুইল্ড নিয়ন সিল্কের দ্বারা, ওপরে গাটাপারচারের প্রলেপ। একটি মজবুত লোহার নোঙর আর সিল্কের তৈরী খুব মজবুত প্রায় পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ একটি দড়ির মইও সঙ্গে নেওয়া হল।

সরকারী জাহাজ 'রেসোলিউট'-এ করে ওরা এক শুভ দিনে অর্থাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে গ্রীনউইচ থেকে জাঞ্জিবার দ্বীপের দিকে রওনা দেয়।

বিপদ হল দ্বীপে নামবার মুখে। ওখানকার ইংরেজ কন্সাল এসে জানালো, বেলুন এ দ্বীপে নামানো দুষ্কর। স্থানীয় আদিবাসীরা ভীষণ বাধা দেবে। তাদের মতে বেলুন নিয়ে উড়তে আসা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ। তাদের দেবতা চন্দ্র সূর্যের এতে অপমান হবে, তাই তারা

এ কার্যে সশস্ত্র বাধা দেবে। খৃষ্টানদের দ্বারা তাদের দেবস্থান অপবিত্রকরণ কিছুতেই বরদাস্ত করবে না কৃষ্ণাঙ্গ নেটিভরা।

—তাহলে উপায়? হতাশার সুরে ডাক্তার শুধায়।

—উপায় আছে। ঐ যে সমুদ্রের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ দেখছেন ওরই একটায় বেলুন নামান।

তাই করা হল। সকাল আটটায় কাজ আরম্ভ হল। বেলুনে হাইড্রোজেন গ্যাস ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বেলুন ফুলে ফেঁপে বিরাট আকৃতির এক গোলাকারে পরিণত হয়ে আকাশে দুলতে লাগলো। মাটির সঙ্গে শক্ত দড়ি দিয়ে বাধা রয়েছে বেলুন। বেলুনের 'কার'—এ ব্যালেন্সের জন্য কয়েক বস্তা মাটি চাপিয়ে দেওয়া হল। জিনিষপত্র তোলা হল আকাশ যানে।

দূরে জাঞ্জিবার দ্বীপে স্থানীয় সশস্ত্র জনতা বেলুন দেখে তর্জন গর্জন করে নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে লাগলো।

বেলা নটায় ডিক কেনেডি, জো এবং ডাক্তার ফারগুসন স্বয়ং গিয়ে উঠলো বেলুনের 'কার'-এ, বেলুনের নাম দেওয়া হল মহারাণীর নামে 'ভিক্টোরিয়া'।

নিচ থেকে জনাকয়েক নাবিক জয়ধ্বনী করে দড়ির বাঁধন খুলে দিতে প্রবল বেগে বেলুন তিনজন মানুষ নিয়ে উর্ধমুখে আকাশে উঠে গেল।

সমুদ্রে থাকা 'রেসোলিউট' জাহাজ থেকে চারটি কামান গোলা-বর্ষণ করে স্যালুট জানালো।

১৫০০ ফুট উঠে গিয়ে ঘণ্টা দুই বাদে বেলুন গিয়ে আফ্রিকার মূল ভূখণ্ডের উপকূলে পৌঁছলো। ডাক্তার চুল্লির আগুন কাটিয়ে বেলুনকে মাটি থেকে মাত্র তিনশ ফুট উচ্চতায় এসে উড়ে চালাতে লাগলো।

'ভিক্টোরিয়া' কিজোটু নামক এক গ্রামের উপর দিয়ে চলছে এমন সময় দেখা গেল গ্রামের সমস্ত লোক ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আকাশ পানে তাকিয়ে লম্ফ ঝম্প সহকারে দুর্বোধ্য ভাষায় চীৎকার করে

উঠছে। কেউ ভীত কেউ ক্রুদ্ধ। কেউ পালাচ্ছে, কেউ আকাশ পানে বিষাক্ত তীর ছুড়ছে বেলুনকে লক্ষ্য করে। কিন্তু বেলুন অনেক উর্ধ দিয়ে নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেল গ্রাম।

—এ আবার কি দৈত্যের মত গাছরে বাবা, ভৃত্য জো বিপুলাকার এক অদ্ভুত আকৃতির বৃক্ষ দেখে বলে ওঠে।

—এ গাছের নাম 'বাওব্যাব', সর্বজ্ঞ ডাক্তার ফারগুসন বলে ওঠে, এগুলো প্রায় একশ ফিট ব্যাসের হয়।

সেদিন সন্ধ্যায় এক পাহাড় ডিঙাতে হল। আগুনের উত্তাপ বাড়িয়ে গ্যাস বাড়িয়ে বেলুনকে অনেক উঁচুতে নিয়ে তবে পাহাড় ডিঙোনো হল। অপর পারে গিয়ে বেলুন নামানো হল ইণ্ডিয়ান বৃক্ষের ওপরে। জো নোঙর বাঁধলো গাছের ডালে।

রাত্রির মত বিশ্রাম এখানে। ভাগাভাগি করে রাত জেগে পাহারায় রইল একের পর এক।

পর দিন ফের যাত্রা শুরু। এদিন তুষার শৃঙ্গ এক বিরাট পর্বত পার হতে হল। পর্বতের ও পারে বেলুন নামিয়ে জো ও কেনেডি দুজনে বন্দুক নিয়ে হরিণ শিকারে বেরিয়ে পড়ল। ডাক্তার রইল বেলুনের মধ্যে 'কার'-এ।

প্রায় দুমাইল দূরে জঙ্গলে গিয়ে ওরা একটা হরিণ মারলো। অকস্মাৎ পেছনে একটা বন্দুকের শব্দ শুনে বেলুনের দিকে চেয়ে চক্ষুস্থির হয়ে গেল।

অতদূর থেকে ওরা দেখলো একদল কালো লোক বেলুনটাকে ঘিরে ধরেছে আর যে গাছে ওটা বাঁধা রয়েছে তার ডালে ডালেও বহু লোক উঠে পড়েছে।

কেনেডি ও জো মাইল খানেক পথ অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত গতিতে পাড়ি জমালো। কানে এল আবার গুলির আওয়াজ। দেখা গেল গাছে ওঠা একজন কালো লোক পাক খেয়ে মাটিতে পড়ে যেতে যেতে গাছেরই একটা ডালে আটকে ঝুলতে লাগলো।

সহসা জো উচ্চৈস্বরে হেসে উঠে বলে উঠল। আরে দেখুন মিঃ কেনেডি ওটা যে লেজ জড়িয়ে ঝুলছে। আরে এগুলো তো মানুষ নয় এ যে দেখছি সবগুলো কালো বাঁদর।

কাছে এসে ওরা কিছু গুলি চালাতে ঐ হিংস্র প্রকৃতির বেবুন বাঁদর গুলো চোঁচা দৌড়ে পালিয়ে গেল।

এর কিছুক্ষণ বাদে 'ভিক্টোরিয়া' ফের আকাশচারী হয়ে বাতাসে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চললো।

সন্ধে সাতটার সময় বেলুন কাইমী নদীর উপত্যকাভূমি পার হল। এর পর এল প্রায় দশ মাইল এলাকার সমতলভূমি।

এরই মধ্যে রয়েছে উগোগোর সুলতান-এর বাড়ি। এরাই হল সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে বোধ করি কিছুটা সুসভ্য জাতি।

বেলুন চললো। সকাল ন'টায় জাঞ্জিবার ত্যাগ করে দুদিন বাদে পাঁচশ মাইল দূরের "কাজে" নামক স্থানে এসে উপস্থিত হল।

কাজে একটি ব্যবসাস্থল। চারদিক থেকে অসংখ্য ক্যারাভেন আসে বিভিন্ন পণ্য দ্রব্য নিয়ে। তার মধ্যে থাকে ক্রীতদাস, হাতীর দাঁতের জিনিষ, তুলো, পোশাক, কাঁচের মালা ইত্যাদি যাবতীয় বস্তু।

কেনা বেচার বাজার সর্বদাই সরগরম। নানাজাতীয় লোকের অবোধ্য চিৎকার, অদ্ভুত সব বাদ্য, ভালুক আর খচ্চর গাধার ডাক, মেয়ে পুরুষের হৈ-চৈ গোল। ক্যারাভেন সর্দারদের তর্জন ব্যজন।

অকস্মাৎ সেই হাটুরে হৈ-চৈ স্তব্ধ হয়ে গেল। সবার দৃষ্টি আকাশের পানে। ওটা ঘিরে বিশালকায় বেলুন ভিক্টোরিয়াকে দেখে সকলেই অবাক।

এর পর যখন বেলুনটি সোজাসুজি মাঠের দিকে নেমে আসতে লাগলো তখন মুহূর্ত মধ্যে নরনারী শিশু ক্রীতদাস, সওদাগর আর নিগ্রোরা ভয়ে আতঙ্কে আশে পাশের কুটিরগুলোর মধ্যে চোখের নিমেষে ঢুকে গেল।

ওপর থেকে ওরা এদের ভয় দেখে হাসতে লাগলো। ডাক্তার

বললে, এ ভয় সাময়িক। তবে খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হবে কেন না তীর বা বুলেট দুয়ের কাছেই আমাদের বেলুন অসহায়।

আস্তে আস্তে ভিক্টোরিয়া নেমে এসে বড় একটা গাছের মাথায় নোঙর ফেললো।

জনতার সাহস ফিরে এল। তারা ঘর থেকে একে একে বেরিয়ে এল। শাঁখের মালা পরা গোপো জাতীয় কিছু লোক প্রথমে এগিয়ে এল। এরা সব পিশাচ সিদ্ধ পুরোহিত শ্রেণীর মানুষ। পেছনে পেছনে এল অন্য সব নরনারী শিশুরদল। ঢোল, বাঁশী, ড্রাম পুরোদমে বাজনা শুরু হল। আর আকাশ পানে তাকিয়ে লোক-গুলি প্রচণ্ড হাততালি দিতে লাগলো।

এটা ওদের প্রার্থনার ভঙ্গি। পিশাচ সিদ্ধ ক'জন পুরোহিত পেছনে ফিরে হাত তুলে কি ইশারা করল। সঙ্গে সঙ্গে জনতার কলরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

দুজন পুরোহিত এগিয়ে এল বেলুনের কাছে। তারপর আরবী ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করল। ডাক্তার তার বক্তব্য থেকে বুঝল এই সব লোকেরা তাদের বেলুন ভিক্টোরিয়াকে তাদের উপাস্য দেবী 'চন্দ্র' বলে ভেবেছে। 'চন্দ্র' স্বয়ং তার তিন পুত্রকে নিয়ে অতি করুনাভরে তাদের এই সূর্যাশ্রিত দেশকে দর্শন দিয়ে ধন্য করতে এসেছেন এই রকম পুণ্য দিবস তাদের জীবনে অবিস্মরনীয় অক্ষয় হয়ে রইল ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর পুরোহিতদ্বয় ডাক্তারের পানে চেয়ে সানুনয় ও সশ্রদ্ধ অনুরোধ জানালো এই বলে যে চাঁদের এই তিন পুত্র যদি অসীম কৃপা করে তাদের মাটিতে পদার্পন করেন এবং তাদের সুলতানকে —যিনি কয়েক বছর যাবত মরনাপন্ন অসুখে ভুগছেন,—তাকে দর্শন দিয়ে নিরাময় করে যান তাহলে এই দেশের যাবতীয় মানুষ চিরবাধিত হয়ে থাকবে।

ডাক্তার বেশ কৌতুক বোধ করে এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন।

সঙ্গে নিলেন ওষুধের বাক্স। যদি সুলতানকে কিছুটা অন্তত চাঙ্গা করা যায়।

দড়ির নির্ধত নামিয়ে ডাক্তার আর জো নিচে নামলো। কেনেডি রইল বেলুনে। চুল্লীতে তাপ বাড়িয়ে যে কোন সময় যাতে উড়ে পালানো যায় তার জন্যে তাকে প্রস্তুত থাকতে বলা হল।

ডাক্তাব ও জো পিশাচ সিদ্ধ পুরোহিত পরিবৃত হয়ে সুলতানের প্রাসাদে গিয়ে ঢুকলো। কতগুলো ঘাঘরা পরা সুন্দরী মেয়ে তাদের অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেল।

দেখা গেল বছর চল্লিশ বছরেব সুলতান মহাশূন্য পালঙ্কে শুয়ে আছে। পাশে বসে আছে তার কয়েকজন পত্নী। ডাক্তার বুঝলো নেশা ভাঙ করে সুলতান বর্তমানে মৃতপ্রায়। বাঁচবার আশা নেই। নিঃসাড়ে পড়ে আছেন।

একটা কড়া অযুধ খাইয়ে দিল ডাক্তার! ফলে সুলতান একটু নড়ে চড়ে উঠলো।

আর তাই দেখে জনতা উল্লাসে নেচে উঠলো। ডাক্তার কাল বিলম্ব না করে সোজা ফিরে এল বেলুনের কাছে।

চাঁদের এক পুত্র হিসেবে কেনেডি বেশ জমিয়ে বসেছিল স্থানীয় কিছু ভক্তদের কাছে।

সহসা ডাক্তাব এসে বললে, তাড়াতাড়ি নোঙর তোল, আর সময় নেই .ঐ দেখ পুরোহিত সহ শত শত লোক ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসছে।

তিনজনে দ্রুত বেলুনে উঠে, নোঙর তুলে আকাশে উড়ে গেল। ব্যাপার কি? লোকগুলো সহসা ক্রুদ্ধ হল কেন? কারণ হল আকাশে দেখা গেল বিরাট চাঁদ উঠেছে। জনতা এবার বুঝতে পেরেছে এই বেলুনটাতো চাঁদ নয়, তাদের উপাস্য দেবতাও নয়। সেই দেবতাতো ঐ আকাশে উঠেছে। এটা জাল চাঁদ। তাই ক্রুদ্ধ জনতা ওদের বধ করবার জন্য তাড়া করে আসছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেলুন পূর্ব ট্যাঙ্গানিকা হ্রদ থেকে উৎপন্ন মালালারাজী নদীর কাছে এল। দেশটা বিরাট বিরাট লম্বা ঘাসে আবৃত। তারই মাঝে দেখা গেল বিশাল কুঁজওয়ালা গরুর পাল চরছে। গভীর বনের মধ্যে প্রচণ্ড গরমের সময় সিংহ, চিতাবাঘ, হায়না ও বাঘেরা আত্মগোপন করে থাকে। মাঝে মাঝে মটমট করে ডাল ভেঙ্গে বিশালকায় হাতীদের নেমে আসতে দেখা যায়।

সহসা বিদ্যুৎ চমকালো। কান ফাটা বজ্রের আর্তনাদ। বৃষ্টি ও ঝড় আসবার আগেই ওদের চুল্লীর আগুন বাড়িয়ে আকাশের বহু উপরে উঠে যেতে হবে। নয়ত বেলুনের রক্ষা নাই। তবুও পারা গেল না। প্রচণ্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টির বাধা পরিপূর্ণ এড়ানো গেল না।

প্রচণ্ড দুর্যোগ কাটিয়ে বহু কষ্টে জীবনমৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করতে করতে একসময় ওরা বেলুনকে নিয়ে ঝঞ্ঝার উপরে উঠে এল। বারো হাজার ফুট উপর দিয়ে নিবাপদে চলতে লাগল বেলুন। নিচে তখন প্রচণ্ড তুফানের দাপাদাপি।

এবার এল পাহাড়ে দেশ। পরদিন সকাল হতেই দেখা গেল চতুর্দিকে পাহাড়। এদের নাম কারাগুয়ে। প্রবাদে বলে এরাই নাকি নীল নদের দোলনাস্বরূপ। এরাই নাকি উকেরিওই নামক বিরাট জলাশয়ের একদিকের দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে (এর বর্তমান নাম ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জা)। এখানে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগস্ট ক্যাপ্টেন স্পেক পদার্পণ করেছিল।

দুপুরে হ্রদের উপর দিয়ে বেলুন চললো। এই বিশাল জলরাশির নাম ক্যাপ্টেন স্পেক দিয়েছিল ভিক্টোরিয়া নায়েঞ্জা। ভিক্টোরিয়া দেশের রাণী আর নায়েঞ্জা শব্দের স্থানীয় অর্থ হল হ্রদ।

নীল নদের উৎপত্তিস্থল এটা। এই নদীই নিচে পড়েছে বহু-দূরের ভূমধ্যসাগরে।

সে-রাতে একটা বিশাল বৃক্ষে নোঙর করা হল। পীচ ঢালা অন্ধকার। আশেপাশে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না।

সহসা মাঝরাতে গাছের নিচে থেকে কি রকম অদ্ভুত শব্দ শুনে তিনজন চমকে উঠল। কেনেডি 'কার'-এর রেলিং ধরে ঝুঁকে পড়ে গাঢ় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। অকস্মাৎ শতুই গজ দূরে একটা আলোর ফুলকি জ্বলে উঠে পরক্ষণেই তা নিভে গেল। এবং সেটা নিভবার পরক্ষণেই একটা আর্ত চীৎকার রাত্রির নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিল। কোন জন্তু জানোয়ারের চিৎকার? না কোন নিশাচর পাখীর? নাকি কোন আর্ত মানুষের?

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ওরা দেখলো অন্ধকারের মধ্যে কতগুলো ছায়ামূর্তি যেন কিলবিল করছে। ইতিমধ্যে ঘন মেঘ ফাঁক হওয়ায় পলকের জন্য চাঁদের আলো এসে পড়াতে কেনেডি দেখলো কতগুলি জংলী মানুষ গাছের নিচে জড়ো হয়েছে। সর্বনাশ। চুপ, চুপ আস্তে।

'কার'-থেকে জো ও কেনেডি বন্দুক নিয়ে গাছে নেমে লুকিয়ে রইল। কালো মানুষগুলো ডাল বেয়ে উঠে আসছে। একেবারে কাছে আসতে দুজনেই গুলি চালালো। সঙ্গে সঙ্গে কজন প্রাণ হারিয়ে ঝুপ ঝুপ করে মাটিতে পড়ে গেল।

—বাঁচাও। বাঁচাও! অকস্মাৎ ফরাসী ভাষায় কার আর্ত চিৎকার ভেসে এল নিচে থেকে।

কে? আরে এ যে কোন শ্বেতাঙ্গ ফরাসী মনে হয়। ঐ জংলীদের হাতে বন্দী হয়ে মহা বিপদে পড়েছে। ওকে বাঁচাতেই হবে। ওকে উদ্ধার না করে আমরা নড়বই না। কিন্তু কি ভাবে? বেলুন থেকে ওরা ফরাসী ভাষায় আশ্বাস দিল।

—শুনুন। আপনি যে-ই হোন নির্ভয়ে থাকুন। এখানে তিনজন বন্ধু আপনার উপর নজর রাখছে।

সমবেত জংলীদের চিৎকার শোনা গেল। হায় হায় জংলীরা বোধকরি ওকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। যা হয় এক্ষুণি করতে

হবে। অথচ কাজল কালো অন্ধকারের মধ্যে কিছু দেখাও যাচ্ছে না। উপায়? ডাক্তারকে জিগ্যেস করে এই অন্ধকারকে আলোকিত করবার কোন প্রক্রিয়া জানা আছে স্যার? আছে। স্থির হল বেলুনকে নিঃশব্দে গাছ থেকে মাটিতে নামিয়ে অতর্কিতে জংলীদের আক্রমণ করা হবে এবং বন্দীকে মুক্ত করা হবে।

ডাক্তার চুল্লীর ইলেক্‌ট্রিকাল ব্যাটারীতে ব্যবহৃত ছুইটি তামার তার নিলে। অতঃপর দুখণ্ড অঙ্গার নিয়ে তাদের মুখদ্বয় ছুঁচলো করলে এবং দুটোকে তারের সঙ্গে বাঁধলো। তারপর কার-এ দাঁড়িয়ে দুটি অঙ্গার ধরে একসঙ্গে ছুঁইয়ে দিলে। মুহূর্তে সর্বব্যাপী এক চোখ ধাঁধানো আলো জ্বলে উঠে আশেপাশের বহুদূর পর্যন্ত প্রায় দিন করে ফেললো।

আর সেই আলোয় দেখা গেল কিছু দূরে কতগুলো কুটির। সেখানে অনেক জংলী নরনারী শিশু দাঁড়িয়ে রয়েছে। বেলুনের ঠিক তলায় মাটিতে পড়ে রয়েছে বছর তিরিশ বয়সের জনৈক শ্বেতাঙ্গ মানুষ। অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থা, সারা শরীরে জখমের চিহ্ন—সেগুলি থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছে। পোষাকে মনে হয় ধর্মযাজক। জংলীরা অত্যুজ্জ্বল জ্বলন্ত ধূমকেতু ভাবল বেলুনটাকে। সঙ্গে সঙ্গে চোঁ চোঁ দৌড়। তক্ষুণি বেলুনকে মাটিতে নামিয়ে ওরা আহত ধর্মযাজককে তুলে নিল কার-এ। কয়েক মিনিটের মধ্যে ফের বেলুন আকাশে উঠে গেল।

ধর্মযাজকের জ্ঞান ফিরতে শোনা গেল তার করুণ কাহিনী। এদেশে এঁসেছিল ধর্ম প্রচারের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু এই হিংস্রতম জংলীদের হাতে বন্দী হয়ে সাংঘাতিক আহত হয়েছে। ওদের সর্দারের মৃত্যুর জন্য ওকে দায়ী করে হত্যা করবে স্থির করে, তাই শুরু হয়েছিল অবিরাম পাশবিক অত্যাচার দিয়ে। কিন্তু আফশোষ! ধর্মযাজক বাঁচলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা গেল। ডাক্তার ফের বেলুন নামালো এক নির্জন প্রান্তরে। তারপর সশ্রদ্ধ-ভাবে অকালে অপঘাতে মৃত শ্বেতাঙ্গ ধর্মযাজককে কবর দিল

সেখানে। স্বর্ণরেণুভরা সোনার খনি-অঞ্চলে ফরাসী ভদ্রলোক চির-নিদ্রায় শায়িত রইল।

এরপর এল এক অভাবনীয় বিপদ।

বেলুনে যে জল সঞ্চিত আছে তাতে আর বেশী সময় চলবে না। অথচ পানীয় জল কাছাকাছি আর পাবার সম্ভাবনাও নেই। এদিকে চুল্লী প্রজ্জ্বলিত রাখবার জন্য পানীয় জল আরও দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে।

বেলুনকে অনেক উঁচুতে নিয়ে যাওয়া হল যাতে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়। বাইনাকুলার দিয়ে চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখা হল। না, কোথাও জলের চিহ্নমাত্র নেই। মরু অঞ্চল দিয়ে চলেছে। যেদিকে দৃষ্টি চলে বালি আর বালি। জাঞ্জিবার থেকে এ পর্যন্ত ২৪০০ মাইল চলে এসেছে ওরা।

এদিকে বাতাস নেই। বেলুন চলছে অতি মন্থর গতিতে। এ বিশাল মরুঅঞ্চল পার হবে কি করে। জলাভাবে বেঘোরে তিনজনকে মারা পড়তে হবে। রাত কাটলো এক ভয়াবহ নিস্তব্ধতায়। অসহ্য গুমোট। বাতাসের চিহ্নমাত্র নেই।

কোথায় জল পাওয়া যাবে? হায় ধারে কাছে কোথাও কোন জলাশয় নেই। আতঙ্কের ছায়া পড়লো সবার মুখে।

বেলুন ভাসছে। আদৌ তেমন চলছে না। বাঁচতে হলে এখন থেকে জল রেশন করো। তাই হল। প্রায় ফোঁটা ফোঁটা জলপান বরাদ্দ হল। সারাদিনে মাত্র কুড়ি মাইল পথ অতিক্রম করা গেছে।

বিকেল চারটের সময় দিকচক্রবালে কতগুলো পাম গাছ দেখে তিনজনেই উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। মরুদ্যান। নিশ্চয় ওখানে মৃতসঞ্জিবনী সুধা জল পাওয়া যাবে।

দু ঘণ্টা বাদে সেই মরুদ্যানে এল বেলুন। কিন্তু হায়। চরম হতাশ হল যাত্রীদল। বিরাট কুঁয়ো শুকনো খটখটে। এক বিন্দু জল নেই। শুধু বালি। আশেপাশে মরিচীকাসম এই মরুদ্যানে এসে জলাভাবে

মৃত মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারের বহু কংকাল পড়ে আছে দেখা গেল। বহুবছর ধরেই বুঝি এই কুঁয়ো শুকনো হয়ে আছে।

বেলুন ফের আকাশে উড়লো। আর মাত্র হু'ঘণ্টা চলবার মত শক্তি আছে বেলুনের। এর মধ্যে যদি কোন জলাশয় না পাওয়া যায় তাহলে ওদের অবধারিত মৃত্যু হবে।

হাওয়া বাতাস বুঝি পৃথিবী থেকে উবে গেছে। অসহ্য সূর্যের তাপ উঠেছে ১১৩° ডিগ্রী। জো ও কেনেডি আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে। চলতি কোন বায়ু পাওয়া যায় কিনা দেখবার জন্য বেলুনকে ৫ হাজার ফিট ওপরে তোলা হল। না বাতাস নেই। এক সময় গ্যাস সংকুচিত হতে বেলুন পুনরায় নেমে এল বালিরাশির ওপর।

এখান থেকে চাড হ্রদ পাঁচশ মাইল দূরে। পশ্চিম সমুদ্র উপকূল চারশ মাইল। রাত এল। কেউ পাহারা দিল না, অথচ কারুর চোখে ঘুম নেই। আধ পাইট জল সঞ্চয়ে। অতএব কেউ আর জলস্পর্শ করল না।

সন্ধ্যের মুখে জো-র মধ্যে পাগলামীর লক্ষণ দেখা গেল। মরিচীকা দেখতে লাগলো সে। চিৎকার করতে লাগলো, ইস্ এ জল বড় নোনতা।

ডাক্তার ও কেনেডি অসাড় হয়ে পড়ে আছে। শেষ সঞ্চয় এক পাইট জল এক সময় কেনেডি ওদের চোখের সামনে পান করে ফেললো। এ দৃশ্য দেখে ডাক্তার ও জো হুজনেই জ্ঞান হারিয়ে বালির মধ্যে পড়ে গেল।

কেনেডি এক সময় রাইফেল মুখে ঢুকিয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হতে ওরা বাধা দিল। জো আর কেনেডি হুজনে বালির মধ্যে হুটোপুটি করতে লাগলো।

—ঐ ঐ চেয়ে দেখো, ডাক্তারের কণ্ঠ আর্তনাদের মত শোনালো।

দেখা গেল দিগন্ত থেকে প্রবল এক ঝড় এগিয়ে আসছে বালির

পাহাড় নিয়ে ওদের পানে। বালির সমুদ্র। সাইমুম। ডাক্তারের উল্লসিত কণ্ঠ।

ভালই হল এবার তাহলে নিশ্চিত ও দ্রুত মৃত্যু, কেনেডি বলে। না। মৃত্যু নয়, ডাক্তার আশ্বাস দেয়। এবার বোধকরি বেঁচে গেলাম।

বহু কষ্টে ওরা বেলুনকে ফের আকাশচারী করে তুললো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে প্রবল ঝড়ো বাতাস এসে প্রচণ্ড গতিতে বেলুনকে নিয়ে চললো।

বেলা তিনটেয় ঝড় থামলো। আকাশ পরিষ্কার, নিচে দেখা গেল মনোরম এক মরুদ্যান। বৃক্ষপরিপূর্ণ জীবনদায়িকা মরুদ্যান। জল। জল। পাগল হয়ে যাওয়ার মত জল দেখা যাচ্ছে। নিমেষে বেলুনকে নামিয়ে নিয়ে আসা হল। আঃ। ঈশ্বর তুমি করুণাময়। প্রাণভরে ওরা জলপান করতে লাগলো।

দেখা গেল প্রচণ্ড ঝড়ের গতিতে চার ঘণ্টায় বেলুন আড়াইশো মাইলেরও বেশী পথ অতিক্রম করে এসেছে।

জল খেতে কুঁয়োর মধ্যে নেমে এক বিপদ দেখা দিয়েছিল। উঠতে গিয়ে ওপরে চেয়ে দেখে এক বিশালকায় সিংহী দাঁড়িয়ে গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কেনেডি গুলি চালিয়ে তাকে খতম করে দিল।

প্রথমটা বাতাস ছিল না। অপেক্ষা করতে হল। তারপর এল হুহু বাতাস। ফের বেলুন আকাশপথে তর তর করো চললো। মরু-অঞ্চল শেষ হয়ে সবুজ ঘাস ও উদ্ভিদের রাজ্য দেখা দিল নিচে।

বেলুন চলতে লাগলো শা-রি নদীর গতিপথ ধরে। নদী ও নদীর পাড়ে অসংখ্য কুমীর কিলবিল করছে।

এবার এসে গেল চাড হ্রদ। বিরাট হ্রদ। বর্ষাকালে এর দৈর্ঘ হয় একশ-কুড়ি মাইল।

লেকের মধ্যে অসংখ্য দ্বীপ। এর মধ্যে বাস করে দুর্ধর্ষ হিংস্র জলদস্যুর দল। এইসব জংলীরা 'ভিক্টোরিয়াকে' দেখে ক্রুদ্ধভাবে ওপর

দিকে বিষাক্ত তীর ছুঁড়তে লাগলো। বেলুনে কিছুই আঘাত লাগলো না।

পথে একপাল অদ্ভুত পাখী দেখা গেল। ওরা হল দাড়িওয়ালা ঈগল। কি বিরাটাকৃতির। ওরা আক্রমণ করলে বেলুনের দফা রফা। কাছাকাছি আসতেই দানব পাখীগুলি তেড়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে তিনটি বন্দুক গর্জে উঠল।

কতগুলো ঈগল মরল বটে কিন্তু তার আগে নিদারুণ ক্ষতি করে গেল বেলুনের গায়। বিশাল ঠোঁটের খোঁচায় বেলুন ছ্যাদা করে ফেলাতে 'ভিক্টোরিয়া' মাটির দিকে নামতে লাগলো।

সর্বনাশ! বেলুন হাল্কা কর গিগ্‌গির। জলের ট্যাঙ্ক, খাবারদাবার ফেলে্‌ দাও। ওরে বেলুন যে চাড হ্রদের গভীর জলরাশির ওপর নেমে যাচ্ছে। হায় হায়।

আর তো কিছু ফেলবার নেই। অকস্মাৎ জো এক কাণ্ড ক'রে বসলো। সে বেলুন থেকে লাফিয়ে চাড হ্রদের জলে পড়ে গেল। তাতে বেলুন প্রায় হাজার ফুট উপরে উঠে গেল এবং ভাসতে ভাসতে হ্রদের উত্তর তীরের দিকে এগিয়ে গেল।

আহা রে জো বেচারা এভাবে প্রাণ দিল। প্রায় আট মাইল যাবার পর ভিক্টোরিয়া চাড হ্রদের উত্তর তীরের এক জায়গায় মাটি স্পর্শ করল।

ছেঁদার জন্য বেলুনের বহিরাবরণ খুলে ফেলা হল। জো-র জন্য ওদের দুজনের মনের অবস্থা খুবই খারাপ।

জো-কে উদ্ধার করতেই হবে। বেলুনকে ফের আকাশে তুলে চাড হ্রদের ভেতর দিকে নিয়ে যাওয়া হল অনুকূল বাতাসে। ভাল সাঁতারু জো যদি এখনো প্রাণে বেঁচে ভেসে থাকে।

কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না জোকে। এক সময় এক ঝড়ের মধ্যে পড়ে বেলুন শো শো করে এগিয়ে চললো বরনু জেলার কুকা শহরের দিকে।

ঝড় কমে এল। আকাশ পরিষ্কার। ওরা দুজনে হাতে বাইনাকুলার নিয়ে সতর্ক দৃষ্টিতে নিরীক্ষন করতে লাগলো নিচের প্রতিটি বস্তু।

এক সময় দেখা গেল নিচে ধুলো উড়িয়ে একদল ঘোড় সওয়ার যাচ্ছে। কাছে আসতে বোঝা গেল পঞ্চাশ জন আরব সৈন্য সামনে চীফ সহ কাকে যেন তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে।

আরে! ওদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। একি স্বপ্ন না সত্যি। ঐ যে জো ঘোড়ায় চড়ে দৌড়ে পালাচ্ছে। আর আরব সৈন্যরা পেছনে পেছনে ছুটে এসে প্রায় বুঝি ধরে ফেললো ওকে।

এদিকে শো শো করে বেলুন ওদের মাথার ওপর এসে পড়ল। কাল বিলম্ব না করে কেনেডি বন্দুক তাক্ করল। একজন আরব সৈন্য জোর পিঠ নিশানা করে বর্শা নিক্ষেপ করতে উদ্যত হতেই 'ক্রম' শব্দে গুলি চালালো কেনেডি; ছিটকে পড়ে গেল সৈন্যটা। এর পর আরও গুলি, আরও মৃত্যু। এবার বেলুন অশ্বারোহী জোর ঠিক মাথার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে।

ডাক্তার কেনেডিকে বললে ৫০ পাউণ্ড ওজনের একটা বস্তু নিচে ফেলে দিতে। বেলুন সঙ্গে সঙ্গে অনেক উপরে উঠে এল। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার বেলুনের কার থেকে একটা দড়ির মই ঝুলিয়ে দিলেন নীচের দিকে।

সুদক্ষ জো বজ্রমুটিতে দড়ির মই ধরে সাবাস খেলোয়াড়দের কায়দায় বেলুনের কার এ উঠে এল ঘোড়া থেকে। তারপরই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।

এর পর বেলুন চললো সুদানের দক্ষিন সীমান্তের জিগুার ওপর দিয়ে।

জোর মুখে শোনা গেল কাহিনী—। প্রচুর সাঁতরে সে এসে ডাঙায় ওঠে। সেখানে দেখে কতগুলো ঘোড়া দাঁড়িয়ে ঘাস খাচ্ছে।

তারই একটা নিয়ে সে পালায়। পরে সে এই আরব সৈন্যদের পাল্লায় পড়ে যায়।

বেলুন চললো এবার একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের ওপর দিয়ে। ২০ তারিখে বেলুন অজস্র নদী নালা ঝরণা খাল বিল পার হয়ে টিমরাকটুর রাজধানী কাববার উপর উপস্থিত হল।

বেলুনের গ্যাস ফুরিয়ে আসছে। অথচ যে করেই হোক পশ্চিম উপকূলে ওদের পৌছতেই হবে। বেলুনের যা যা বস্তা ছিল হালকা করবার জন্য সব ফেলে দেওয়া হল। চুল্লিতে পুরোদমে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হল। যে করেই হোক বেলুনকে ভাসমান রাখতেই হবে।

সহসা একটা পাগলা হাওয়া এসে ওদের ডা-হো-মের রাজ্যের দিকে উড়িয়ে নিয়ে চলল। সর্বনাশ। অতি হিংস্র ধরণের লোক ঐ রাজ্যে বাস করে। এদের রাজা উৎসবের দিনে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে আনন্দ পায়। এখানে যাওয়া মানেই অবধারিত মৃত্যু।

এদিকে বেলুনের গায়ের গাটাপার্চারের প্রলেপ গরমে গলে গিয়ে বেলুন ফুটো হয়ে গ্যাস বেরুতে লাগলো। বেলুনের বর্তুলাকার নষ্ট হয়ে তা লম্বাটে ধরণের হয়ে উঠল।

আরেকটা বাধা। সামনে আসছে বিশালকায় সুউচ্চ পর্বত। তাকে অতিক্রম করবার আর সাধ্য নেই বেলুনের। এক উপায় বাদবাকি সবকিছু ফেলে দেওয়া, খাবারদাবার বন্দুক। তাই করা হল। নয়ত পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে অনিবার্য মৃত্যু, কম্বল, গোলাগুলি সব ফেলে দেওয়াতে বেলুন উঠতে লাগলো।

এবারও জো নেমে গেল পাহাড়ের প্রায় শীর্ষে। হাল্কা বেলুন চূড়া ছুঁই ছুঁই করে পার হয়ে গেল। জো-ও ফের লাফিয়ে উঠল কার-এ।

পাহাড় পেরিয়ে সেনেগল নদী। এখানেও নামা বিপজ্জনক। তাই গ্যাস বাড়াবার ৯০০ পাউণ্ড যন্ত্রপাতি ফেলে দেওয়া হল।

সে-রাতে এক বিপদ। যে গাছে নোঙর করে ওরা রাত কাটাচ্ছিল গভীর রাতে তার তলায় চুপিসারে জংলীরা এসে অসস্মাৎ বিরাট আগুন জ্বালিয়ে দেয়। নোঙর তোলবার সময় পেল না, দড়ি কেটে আকাশে উঠে তবে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু থেকে বাঁচলো অভিযাত্রীত্রয়।

বিপদের কি শেষ আছে। কিছুদূর যাবার পর দেখা গেল নিষ্ঠুর ট্যালিবাস জাতীয় আফ্রিকাবাসী জংলীরা ঘোড়া চালিয়ে বিকট চিৎকার তর্জন গর্জন করতে করতে বেলুনের তলা দিয়ে ছুটে আসছে। এরা বড় ভয়ংকর জীব। এদের হাতে পড়লে এরা জ্যান্ত ছিঁড়ে খাবে সবাইকে।

এদিকে বেলুন নেমে যাচ্ছে নিচের দিকে। নিচেকার দস্যুদল তাদের বন্দুক থেকে গুলি চালাচ্ছে।

এক সময় বেলুন মাটি স্পর্শ করল এবং রবারের বলের মত ভূমিতে ধাক্কা খেয়ে ফের আকাশে উঠে গেল।

আরও হাল্কা করতে হবে বেলুনকে। কি উপায়ে? বেলুনের 'কার' খুলে ফেলে দিল ওরা—তারপর বেলুনের গায়ের জাল ধরে তিনজন ঝুলে রইলো।

এইভাবে সেনেগাল নদী কোনক্রমে পার হয়ে গেল 'ভিক্টোরিয়া'। এপার সম্পূর্ণ নিরাপদ।

পার হবার আগে বেলুন নেমে পড়েছিল মাটিতে। ডাক্তার কতগুলো শুকনো ঘাস জ্বালিয়ে ফের চাঙ্গা করে তোলে বেলুনকে।

ওদিকে দেখা গেল ট্যালিবাস দস্যুরা হুহু শব্দে এগিয়ে আসছে। আর বুঝি পরিত্রাণ নেই। ঈশ্বর সহায়! আগুনের তাপে গ্যাস বর্ধিত হয়ে ধীরে ধীরে বেলুন একটু উপর দিকে উঠে নদী পার হতে লাগলো।

নদীর অপর পারে একদল ফরাসী সৈন্য ওদের সাদর অভ্যর্থনা করল। কিন্তু আফশোষ নদীর জলে পড়ে বেলুনটা ভেসে চলে গেল কোথায় কে জানে।

ফরাসী সৈন্যরা হাত বাড়িয়ে ওদের তিনজনকে না ধরে ফেললে স্বনামধন্য ডাক্তার কার্গুসন ও তার দুজন সুযোগ্য সঙ্গীদ্বয়ের সলিল সমাধি হয়ে অকালে মৃত্যু হত।

সজল নেত্রে ওরা বিলীয়মান বেলুনটার পানে তাকিয়ে রইল।

ওরা পৌঁছলো ২৪য়ে মে। ২৭ তারিখে মেডিন নামক স্থানে গেল। সেখান থেকে ব্যাসিলিস্ক স্টিমারে চড়ে সেনেগাল। তারপর দশই জুন সেন্ট লুই-তে।

অতঃপর বৃটিশ জাহাজে করে ২৫শে জুন পোর্টস্ মার্ডয় বন্দর। সেখান থেকে লণ্ডন।

কী বিপুল অভ্যর্থনা তারা পেল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও রয়েল জিওগ্রাফিকাল সোসাইটিব কাছ থেকে। ১৮৬১ তে দুঃসাহসিক অভিযানে সাফল্যের জন্য ওদের স্বর্ণপদক দেওয়া হয়।

এইভাবে আফ্রিকা মহাদেশের ওপর দিয়ে পাঁচ সপ্তাহ বেলুন ভ্রমণের দুঃসাহসিক অভিযান সাফল্য লাভ করে।

সংবাদপত্রে এ তাজ্জব সংবাদটি পড়ে লোকে হতবাক হয়ে গেল। বলে ? এ আবার কি ধরণের সামুদ্রিক জীব ?

নিউ ইয়র্ক একজামিনার ২০শে জুলাই ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের কাগজে বের হল : এক অতিকায় সামুদ্রিক সর্প জাহাজকে আক্রমণ করে জখম করে ফেলে।

জাহাজের নাম গভর্নর হিগিন্সন। অস্ট্রেলিয়ার কাছাকাছি সমুদ্রে এই জাহাজের ক্যাপ্টেন ও নাবিকরা আজব এক সামুদ্রিক জীব প্রত্যক্ষ করেন।

প্রথমে ক্যাপ্টেন দূর থেকে দেখেন সামনে একটা কালো রঙের কি সমুদ্রে ভাসছে। পরে মনে হয় ওটা একটা টিলা হবে বা। কিন্তু তিনি অবাক হন ভেবে যে এ সমুদ্রপথ তার নখদর্পণে। এখানে তো কোন টিলা বা অর্ধ-ভাসমান পাহাড় নেই। তাহলে ?

তারপর দূরবীনের ভেতর দিয়ে তার চোখ ছানাবড়া হয়ে যায়। টিলাটা নড়ছে। তবে তো এটা টিলা নয়। তবে কি তিমি মাছ ? এত বড় তিমি দেখা দূরে থাক শোনেনও নি কখনো।

একটু বাদে দেখা গেল সেই তিমির মত দেহ থেকে ফোয়ারা দিয়ে দুইটি ফুটোর মধ্য দিয়ে শূন্যে জল উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে ভীষণ তোড়ে। কি দারুণ মোটা জলধারা। চারদিকে সে ধাক্কায় ঢেউ তুলে দিচ্ছে। উচ্চতায় একশ ফুটেরও উপরে উঠছিল জল।

ক্যাপ্টেন যথারীতি জাহাজকে যথাসম্ভব প্রাণীটি থেকে দূরে নিয়ে গেলেন। সব সময় তীক্ষ্ণ নজর রাখলেন ওটার দিকে। তারপর এক সময় ভস করে ডুবে গেল সেই অতিকায় জীব। জলের তলায় মিলিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

গভর্নর হিগিন্সন এগিয়ে যেতে লাগলো তার গন্তব্যস্থানের পানে।

অবশ্য চারদিকের সমুদ্রে কড়া নজর রাখতে লাগলো ক্যাপ্টেন ও নাবিকেরা।

এরপর ঘটলো সেই অঘটন। সাংঘাতিক ঘটনা। খানিকক্ষণ বাদেই সেই অতিকায় তিমি সদৃশ জীবটি সমুদ্র তোলপাড় করে ভেসে উঠলো। তারপর ভীমবেগে এই জাহাজকে লক্ষ্য করে ছুটে.আসতে লাগলো বুনো ও ক্ষ্যাপা মোষের মত।

সর্বনাশ! ক্যাপ্টেন প্রমাদ গণলেন। জাহাজকে যথাসম্ভব জোরে অন্যপথে চালিত করবার আদেশ দিলেন।

কিন্তু সবই বৃথা। ঐ দানবটি এসে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে প্রবল ধাক্কা দিল গভর্নর হিগিন্সনকে। সে দারুণ ধাক্কায় বেসামাল হল জাহাজ। মাস্তুল ভাঙলো, পাল ছিঁড়লো, ডেক ভাঙলো, নাবিকদল ছিটকে এখানে ওখানে পড়ে রক্তাক্ত হল।

ধাক্কা মেরে সেই জীব অদৃশ্য। ক্যাপ্টেন কোন মতে এই আহত জাহাজকে নিকটবর্তী এক বন্দরের আশ্রয়ে এনে তুললেন।

অনেকেই নাম দিলেন এটাকে সামুদ্রিক সাপ। অতিকায় জলজ সরীসৃপ।

সংবাদপত্রে এ সংবাদ পাঠে দারুণ চাঞ্চল্য পড়ে গেল শহরে বন্দরে। পণ্ডিতেরা অনুসন্ধানের জন্য উৎসুক হয়ে পড়লেন।

নানা প্রশ্নে জর্জরিত হল গভর্নর হিগিন্সনের ক্যাপ্টেন। কেমন দেখতে? কি রকম রঙ? কত বড় দীর্ঘ হবে? তিমি তো কখনো জাহাজকে তেড়ে আসে না। তাহালে এ কোন রহস্যময় জল-প্রাণী? মানুষের জ্ঞানের বাইরে এই প্রাণীর অস্তিত্ব এল কি করে?

জীব বিজ্ঞানীরা স্থির করলেন এই অজ্ঞাত প্রাণীটির সন্ধানে গিয়ে এর সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ অচিরেই করতে হবে।

নিউ ইয়র্কের পণ্ডিত ব্যক্তি প্রোফেসর আরোনাক্স হবেন এই অভিযানের নায়ক। তিনি সমুদ্র অভিযানের সমস্ত ব্যবস্থাদি পাকা করে ফেললেন।

নেভি থেকে একটি জাহাজ দেওয়া হবে প্রফেসরকে, নেভি কমাণ্ডার ফারাউ এসে প্রফেসারকে সবকিছু বলে অভিবাদন জানিয়ে গেলেন।

এরই জাহাজ আব্রাহাম লিঙ্কলন নিয়ে যাবে প্রফেসারকে।

এই কমাণ্ডার ফারাউ একজন লোকের কথা বললেন যার নাম নেডল্যাণ্ড। এ লোকটি হার্পুণ চালাবার জন্য উপাধী পেয়েছেন প্রিন্স অফ হার্পুনার্স। তিমি শিকারে নাকি এর জুড়ি নেই।

এই নেডল্যাণ্ড প্রফেসরের সঙ্গে যেতে চায়, অবশ্য প্রফেসার যদি রাজি থাকেন। অবশ্যই রাজি। সানন্দে মত দিলেন তিনি। এমন একজন তিমি শিকারী এই অভিযানে পাওয়া প্রকৃতই ভাগ্যের কথা।

কমাণ্ডার নেডকে সঙ্গে করে নিয়ে পরিচয় করে দিলেন।

স্থির হল পরদিন নটায় জাহাজ ছাড়বে। প্রফেসর এসে জাহাজঘাটায় উপস্থিত হলেন।

বন্দরে কী দারুণ ভীড় হয়েছে নরনারীদের। একটা অদ্ভুত সামুদ্রিক জীবের অনুসন্ধানে চলেছেন দেশের নামকরা একজন জীব-বিজ্ঞানী। এই রহস্যজনক প্রাণীটি ধরা পড়ুক এই কামনা উপস্থিত জনতার।

জাহাজের ক্যাপ্টেন এসে অভিবাদন জানিয়ে স্বাগত জানালেন প্রফেসর আরোনাক্সকে ও তাঁর সঙ্গী নেডল্যাণ্ড এবং সহকারী কন্সেলকে।

নেডকে পেয়ে ক্যাপ্টেনও খুব খুশী হলেন।

জাহাজ ছেড়ে দিল। জাহাজঘাটার জনতা উল্লাসে হাততালি দিয়ে বিদায় অভিনন্দন জানালো অভিযাত্রী প্রফেসরকে।

শান্ত সুন্দর সমুদ্র। জাহাজ চলেছে তরতরিয়ে। অজানার সন্ধানে চলেছেন ওরা। মনে মনে দারুণ উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য।

গল্প গুজব ডেক-এ পদচারণা ও চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সময় কাটলো। দিন শেষ। অন্ধকার রাত শুরু। রাতেই ভয়। কখন

এলে সেই অতিকায় প্রাণীটা হানা দেয় সেই ভয়। ওটা আবার ছুঁচলো মুখ দিয়ে বুনো মোষের মত এসে গোত্তা মেরে জাহাজ ভেঙে দেয়।

সতর্ক দৃষ্টি রাখছে সবাই। অন্ধকারে যতদূর সম্ভব দূরবীন দিয়ে সমুদ্রের চারদিক নিরীক্ষণ করে চলছিল ওরা।

হাতে কালান্তক হার্পুন নিয়ে নেডল্যাণ্ড অতন্দ্র প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে রইল। মনে তার দুর্জয় পণ যে প্রাণীই হোক নাগালের মধ্যে এলে আর রক্ষা নেই। কোন তিমির নিস্তার নেই তার হাতে।

কিন্তু ওটা যে তিমিই এ গ্যারান্টি কে দেবে? এঁকে তো অত বড় তিমি দেখা যায় না। তার উপর তিমি কখনো জাহাজ আক্রমণ করে না। এ জন্তুটা জাহাজকে প্রচণ্ড ঢুঁ মেরে কাৎ করে ফেলবার উপক্রম করে।

তাহলে? যতদিন না ধরা পড়ে ততদিন একমাত্র বুঝি ঈশ্বরই বলতে পারেন ঐ আজব জীবটি কি প্রাণী।

গাঢ় অন্ধকারের মধ্য দিয়ে জাহাজ এগিয়ে চলেছে।

এক সময় রাত শেষ হয়ে নোনা সমুদ্রে প্রভাত হল। সূর্যোদয় হল। শান্ত সমুদ্র। সবাই রাত জাগা চোখ নিয়ে চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে চললো। জাহাজ চলেছে অবিরাম গতিতে। কিন্তু সেই অতিকায় তিমির চিহ্নমাত্র কোথাও দেখা গেল না।

জাহাজ চলেছে। দিন যায় রাত্রি আসে। রাত শেষে ফের দিন। দিন কাটে। প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে দক্ষিণ আমেরিকার পাশ দিয়ে চলে জাহাজ। না, কোন পাত্তা নেই সেই রহস্যময় প্রাণীর, জলজ দানবের।

এদিকে এক ঝামেলা উপস্থিত হল। জাহাজের নাবিকরা বেঁকে বসলো। এই ধরনের অনির্দিষ্ট কালের জন্য অজ্ঞাত বস্তুর সন্ধানে বাড়ি ঘর ছেড়ে তারা আর সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরতে নারাজ।

প্রমাদ গণলেন ক্যাপ্টেন। প্রফেসার শুনে বললেন, ঠিকই।

বেচারাদের দেশে স্ত্রী পুত্র পরিবার রয়েছে। এ ধরনের বিপজ্জনক কাজে বেশীদিন ওদের আটকে রাখা উচিত নয়।

নেডল্যাণ্ড এক প্রস্তাব দিল। আর তিনটি দিন সন্ধান করে ফেরা যাক। এর মধ্যে আজব প্রাণীটির দেখা মেলে ভাল নয়ত চতুর্থ দিনে অবশ্যই দেশের পথে পাড়ি জমাবে। এ কথায় নাবিকরা রাজী হয়ে গেল।

জাহাজ চললো কুলকিনারাহীন নীল সমুদ্র বেয়ে, একদিন এক রাত্রি কাটলো। কই সেই রহস্যময় জীব। দুদিন দুরাত্রি কাটলো। তথৈবচ।

তৃতীয় দিন সকালে অতন্দ্র প্রহরী নেডল্যাণ্ড দুরবীনে চোখ লাগানো অবস্থায় অকস্মাৎ বিকট চীৎকার করে উঠলো, ঐ যে ঐ যে বোধ করি সেই আজব জন্তুটা যাকে আমরা খুঁজে ফিরছি।

কই ? কই ? কোথায় ? প্রফেসর, ক্যাপ্টেন প্রভৃতি হাতে দুরবীন নিয়ে ছুটে এলেন ডেক-এ।

ঠিকই দিকচক্রবালে কি একটা কালো মতন বস্তু ভেসে চলেছে। যদিও বেশ দূরে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

এবং দেখেশুনে এ জাহাজের সকলের পিলে চমকে উঠলো। সেই তিমিসদৃশ জন্তুটা তীর বেগে ওদের জাহাজ লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে যমের মত।

সর্বনাশ। এরপর প্রচণ্ড ঢুঁ। জাহাজ ভেঙে চুরমার এবং সকলের অবধারিত মৃত্যু।

কি ছিল ওটার মনে। আসতে আসতে ভুস করে ডুব দিল সমুদ্রতলে। জলের তলা দিয়ে এসে আঘাত হানবে না তো! কে জানে! কিন্তু ঘণ্টা কয়েক কেটে গেল অসহনীয় আতঙ্কে, না জাহাজে তো আঘাত হানলো না।

ধীর গতিতে বিভীষিকাময় সমুদ্রে জাহাজ চলতে লাগলো। সেদিন কাটলো, সে রাতও কাটলো। পরদিন সকালে ফের নেড-এর চীৎকার, ঐ যে ঐ যে আবার ভেসে উঠেছে। বহুদূরে একটা কালো

বিন্দুর মত মনে হচ্ছে। স্থির হল এবার ঐ জন্তুটার পেছনে ওরাই জাহাজ নিয়ে ধাওয়া করবে।

জাহাজ মুখ ঘুরিয়ে ফেলে সেই দূরের কালো প্রাণীটির দিকে এগিয়ে চললো। প্রত্যেক বুকের ধড়ফড়ানি বেড়ে গেছে প্রবল উত্তেজনায়।

আশ্চর্য! দূরত্ব আর কমে না। দিক চক্র রেখায় তেমনি চলেছে বিন্দুবৎ প্রাণীটি। জাহাজ এগোচ্ছে তিমিটাও যেন এগিয়ে যাচ্ছে সমানে তালে!

সারাদিন কেটে ভয়াবহ রাত্রি এল। নেড-এর উৎসাহ সর্বাধিক। আজই হেস্ত নেস্ত চাই। সত্যিই এক সময় ওরা অনেক কাছে এসে পড়লো! আরে! ঘুমিয়ে পড়েছে নিচে পাহাড়সদৃশ অতিকায় তিমিটা। লেজটা কি রকম সমুদ্রের অনেক উপরে তুলে রেখেছে।

জাহাজ প্রাণীটার দুশো গজের মধ্যে এসে পড়লো। আরও কাছে আরও কাছে! উঃ কি বিরাট আকৃতি। পঞ্চাশ গজ মাত্র দূরত্ব এমন সময় সেটা নড়ে উঠলো। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলো মনে হয়। জলধারা শুরু হয়ে গেল শূন্য পানে, কি তোড়রে বাবা।

আর ওদের ভাববার সময়ও দিল না। বিদ্যুৎ বেগে এসে সাংঘাতিক আঘাত হানলো ওদের জাহাজে। প্রচণ্ড ঝাঁকুনি…জাহাজ কেঁপে উঠে, টাল মাটাল হয়ে দুলতে লাগলো। জাহাজ ভেঙ্গে গেছে বুঝি।

নাবিক মাল্লারা চীৎকার করে ছিটকে পড়লো এখানে ওখানে। প্রফেসর আরোনাক্স গেলুম গেলুম শব্দে টাল সামলাতে না পেরে সমুদ্রজলে পড়ে গেলেন।

জলে পড়ে, নাকানি চুবানি খেতে খেতে ভাসতে লাগলেন প্রফেসার। 'স্যার আমি'—জলে সাঁতরে পাশে এল সহকারী কন্সেল। কিছু পরে ভাসন্ত অবস্থায় নেড ও এসে উপস্থিত হল কাছাকাছি।

প্রফেসারের অবস্থা খারাপ হয়ে আসছিল। তিনি আর নোনা

জল ও ঢেউ এর ধাক্কা সামলাতে পারছিলেন না। কন্সেল ও নেড না ধরলে হয়ত তিনি ক্লান্তিতে ডুবে যেতেন।

কিছুক্ষনের মধ্যে ওরা চমকে উঠলো তিনজন, আরে ঐ তো তিমি নয়, এ যেন পাহাড় মনে হচ্ছে।

ওরা ভাসতে ভাসতে এসে ওটার গায়ে ঠেকলো। কন্সেল ও নেড ওটার ওপরে উঠে প্রফেসারকেও ধরাধরি করে সেখানে তুললো। তিমিটার পিঠে? না পাহাড়ের পিঠে? না কি কোন ছোট দ্বীপ?

আরে! পিঠতো পাথরের নয়। এ যে দেখছি ইস্পাতের তৈরী। তাহলে তো তিমি নয়, পাহাড় নয়, এ যে মনে হচ্ছে কোন জাহাজ বা যন্ত্র বিশেষ। সেরেছে বলতে বলতেই ইস্পাতের ভাসমান বস্তুটা নড়ে উঠল। ব্যাপার কি রে বাবা। পড়তে পড়তে সামলে নিল তিন জন।

আবার এক স্পন্দন ও ধাতব শব্দ। সবিস্ময়ে ওরা দেখলো ইস্পাতের পিঠের একটা অংশ থেকে ডাসা সরে গিয়ে একটা ফাঁকের সৃষ্টি হল।

—কে। কেরে বাবা এরা, বলে সেই ফাঁকে উঠে আসা একটি মানুষের মুখ নিমেষে ভেতর ঢুকে গেল। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়, এ যন্ত্র বা তিমি সদৃষ জাহাজটার মধ্যে তাহলে মানুষও আছে।

অভিযাত্রী তিন জন স্থানুর মত বসে রইলেন। এর পর সেই পিঠের গর্ত থেকে বেরিয়ে এল কয়েক জন মানুষ। তারা এগিয়ে এল ওদের কাছে।

কঠোর কণ্ঠে একজন প্রশ্ন করলো, কে তোমরা? এখানে এলে কি ভাবে?

ওদের দেখে শুনে বাক শক্তি রহিত হয়ে গেছে। কোন জবাব জোগালো না মুখে।

—কথা বলো। উত্তর দাও, যন্ত্র থেকে বেরিয়ে আসা একজন ফের প্রশ্ন করে।

তবুও এরা নিরুত্তর। তখন ওরা এসে প্রফেসার সহ তিনজনকে ধরে নিয়ে ইস্পাতের গর্ত দিয়ে সেই আজব যন্ত্রটার ভেতরে নিয়ে গেল।

মোহাবিষ্টের মত ওরা তিনজন অনুসরণ করে নিচে নেমে গেল। এ কোথায় এল ওরা। এ যে স্বপ্নাতীত পরমাশ্চর্য ঘটনা। সিড়ি বেয়ে নেমে দেখা গেল আলোয় আলোয় ভরা এ এক ইস্পাতের বাড়ি বিশেষ। ঘরের পর ঘর। ওদের এনে একটা ঘরে বসানো হল। তখনও ওদের সম্বিৎ ফেরেনি। যা দেখছে যা শুনছে তা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। জলের মধ্যে কল, তাও কিনা ভাসে ডোবে। ভেতরে বিদ্যুতের আলো।

—কি জন্যে তোমরা এখেনে এসেছিলে?

ওরা তেমনি বাকশক্তিহীন। ওরা ভাবলো তিনজন আগন্তুক ভয়ে অবশ হয়ে আছে। খাবার নিয়ে এল। নেড অতর্কিতে খাবার নিয়ে আসা ভৃত্য গোছের মানুষটাকে ছুরি নিয়ে আক্রমণ করতে অকস্মাৎ ভয়াবহ এক কণ্ঠ যেন গর্জন করে উঠলো ঃ

—খবরদার ওর গায়ে হাত তুলো না। এক্ষুনি ছেড়ে দাও বলছি।

অদ্ভুত গুরুগম্ভীর গলা শুনে নেড মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে এক অদ্ভুত মূর্তির মানুষ। লম্বা দাড়ি গোঁফ সমন্বিত এক ভয় পাবার মত লোক দাঁড়িয়ে, গায়ে লাল রঙের কোট, পরণে নীল প্যান্ট, গলায় রক্তাভ টাই, চোখে কঠোর ব্যক্তিত্বময় দৃষ্টি। যেন অগ্নি ঝরছে কথায় ও চাউনীতে।

—আপনি···? প্রফেসরের কণ্ঠে প্রথম প্রশ্ন ধ্বনিত হল।

—আমি? সেই দাড়িওয়ালা ব্যক্তি বাজখাই কণ্ঠে বললেন, যে জাহাজে আপনারা বসে আছেন সেই নটিলাস নামক ডুবো জাহাজের ক্যাপ্টেন আমি। আমার নাম ক্যাপ্টেন নেমো। জলের তলায় ডুবে এ জাহাজ চলে।

প্রফেসার ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের বিস্ময়ের সীমা রইল না শুনে।

জাহাজ? তাও কিনা ডুবো জাহাজ? এ আবার কি বস্তু। এও কি বাস্তবে সম্ভব?

—বলেন কি এটা একটা জাহাজ?

—হ্যাঁ জাহাজ এবং ডুবো জাহাজ, লম্বা দাড়ি গোফওয়ালা ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, কেন আপনারা আমার জাহাজে এসে উঠেছেন। এখন সেই অপরাধে আপনারা আমার বন্দী, এবং বন্দীদের প্রতি যে কোন দণ্ডাদেশ আমি দিতে পারি।

—দেখুন আপনি ভুল করছেন, প্রফেসার বলবার চেষ্টা করলেন, আমরা অনন্যোপায় হয়ে এখানে এসে উঠেছি। সেই অপরাধে কিন্তু কোন সভ্যসমাজে বন্দীত্ব আসে না।

—চুপ করুন, প্রায় গর্জন করে উঠলেন ক্যাপ্টেন নেমো, সভ্য সমাজের কথা আমার কাছে উচ্চারণ করবেন না। আপনাদের সেই সমাজকে আমি মানি না। আমি ঘৃণাভরে সেই সমাজকে পরিত্যাগ করে চলে এসেছি। ডাঙার মানুষের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ থেকে সহসা কণ্ঠ কোমল করে বললেন, তবে ভয় পাবেন না। আপনাদের সঙ্গে আমার কোন কলহ নেই। জানি অনিচ্ছাক্রমে অজান্তেই আপনারা এসে উপস্থিত হয়েছেন আমার এই নটিলাস-এ, তাই আপনারা আমার অতিথি। আপনারা আমার কাছ থেকে বন্ধুর মত ব্যবহারই পাবেন। তবে একথাও জানিয়ে দিতে চাই যে এ জাহাজ থেকে আর আপনাদের ফিরে যেতে দেওয়া হবে না।

—সেকি!

—হ্যাঁ তাই। এখন আমার অধীনে আপনারা।

কোন প্রতিবাদ করে ফল হবে না। চুপ করে রইলেন বন্দীত্রয়। উপায়হীন তারা। আমৃত্যু বুঝি কাটাতে হবে এই রহস্যময় অদ্ভুত জলযান ডুবো-জাহাজে, মনটা খারাপ হয়ে গেল।

ক্যাপ্টেন নেমোর নির্দেশ অনুসারে তাঁকে অনুসরণ করে চললো ওরা জাহাজের অভ্যন্তর সন্দর্শনে। কি এলাহি ব্যাপার।

প্রথমে গেল একটা হল ঘরে, চারদিকে বই। কি বিরাট লাইব্রেরী ঘর। তারপর গেল যাদুঘরে। সে ঘরে বুঝি পৃথিবীর যাবতীয় দুষ্প্রাপ্য জিনিষ রয়েছে কাঁচের আলমারীগুলিতে। এরপর বৈঠকখানা ঘর। কী সুন্দর দামী দামী কোচ, টেবিল, ছবিতে ভরা ঘর। ঘরে একটি অর্গান আছে। তাহলে গান বাজনাও হয় বুঝি? এমনি পরপর অনেক কেবিন দেখা হল। তাজ্জব হয়ে দেখবার মত ঘর। নেমো মানুষটা অতীব সৌখিন এবং জ্ঞানী গুণী বুঝতে বাকি রইল না। জলের নিচে একি আজব জাহাজ তৈরী করেছেন তিনি। শুধু জাহাজ নয় তাকে অকল্পনীয় ভাবে নানা ভূষণে সজ্জিত করেছেন।

মুগ্ধ-বিস্মিত প্রফেসার জানতে চান এই অদ্ভুত ডুবো জাহাজ কিভাবে জলের উপর ভাসে বা জলের নিচে ডুব দেয় বা কি করেই বা জলতল দিয়ে পরিভ্রমন করে মাইলের পর মাইল। জলের নিচে অক্সিজেন বা বাতাসের অভাব কিভাবে মেটে।

তার উত্তরে মৃদু হেসে দাড়িতে বাঁ হাত বুলিয়ে ক্যাপ্টেন নেমো যা বলে যান শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে থাকেন প্রফেসার ও তার সঙ্গী দুজন।

ক্যাপ্টেন নেমো জানান : কি ব্যবস্থা নেই এ জাহাজে। আছে ইলেকট্রিক মোটর, আছে একাধিক ট্যাঙ্ক। পাম্প চালিয়ে ট্যাঙ্ক জলে ভর্তি করা হলে জাহাজ জলের নিচে নেমে যায়। আবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইলেকট্রিক পাম্পে সে ট্যাঙ্ক খালি করে ফেললে জাহাজ জলের উপর ভেসে ওঠে। বড় বড় বাতাসের ট্যাঙ্ক উপরে উঠলে ভর্তি করে নেওয়া হয় বাতাসে অক্সিজেনে। সে বাতাসে লোকলস্কর সহ প্রত্যেকের একমাস চলে যায়। অতএব মাসখানেক জলের তলায় অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারে এই আজব ডুবো জাহাজ 'নটিলাস'।

—ধন্য ধন্য আপনি ক্যাপ্টেন নেমো, প্রফেসর আরোনাক্স উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠলেন প্রশংসায়, অলৌকিক শক্তিধর আপনি। বিজ্ঞানী আছে, পণ্ডিত আছে, কিন্তু সে বিদ্যাকে এমন হাতে কলমে কাজে লাগানো মানুষ আমি জীবনে এই প্রথম আপনাকেই দেখলাম।

দিন কাটতে লাগলো। নতুন নতুন অদ্ভুত বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার উত্তেজনায় দিন কেটে গেল। কিন্তু মনের মধ্যে সর্বদাই খচ খচ করতে থাকবে ওরা বন্দী। এ জীবনে আর স্বজন পরিজনের কাছে ডাঙায় ফিরে যেতে পারবে না। কি ভয়াবহ কথা। এ তো মৃত্যুর সামিল।

নেড ও কন্সেল সব সময় এই চিন্তাই করে কি ভাবে এই অদ্ভুত মানুষটার হাত থেকে নিষ্কৃতি নিয়ে পালানো যায়। নানা ফন্দী ফিকিরের কথা ভাঁজতে থাকে। কিন্তু কিছুতেই কোন উপায় ভেবে পায় না।

এর মধ্যে ক্যাপ্টেন নেমো এক চাঞ্চল্যকর প্রস্তাব দিলেন, জলের তলায় শিকার!

কোথায় শিকার? জলের তলায়। বলেন কি। সত্যিই তাই। ডাঙায় যেমন বন জঙ্গল আছে, সমুদ্রতলেও তেমনি আছে বনজঙ্গল। সেখানেও চরে বেড়ায় নানা জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী। তাদের শিকার করতে কম মজা কম রোমাঞ্চ নয়।

বেশ রাজি। সোৎসাহে ওরা তিনজন রাজি হয়ে যায়। কিন্তু জলের তলায় নামব কি করে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেব কি করে, নাকে মুখে নোনা জল ঢুকে যাবে না?

না তা যাবে না। ডুবুরির পোষাক আছে। তাই পরে নামলে কোন অসুবিধে হবে না।

তা যেন হল, শিকার করবে কি দিয়ে? জলের তলায় গুলি চলবে কি করে?

ক্যাপ্টেন নেমো বলেন, চলবে বন্দুক। গুলিগুলি হল কাঁচের

এবং তাতে থাকবে ইলেক্‌ট্রিক চার্জ করা। গুলির আঘাত এবং ইলেকট্রিক শক্‌ দুইয়ে মিলে শিকার খতম হবে।

জাহাজের তলার দিকে একটা পাটাতন সরিয়ে কাঁচের আবরণের ফাঁকে তিনি দেখালেন সমুদ্রতলের সেই অবিশ্বাস্য বন। আঃ কি নয়ন মনোহর দৃশ্য।

রবারের ডুবুরির পোষাক। পায়ে ধাতু পোরা ভারি জুতো ডুবে থাকবার জন্য। মাথায় হেলমেট তামার। চাপা বাতাস ভর্তি রবারের ব্যাগ পিঠে বাঁধা। কোমরে বাঁধা লণ্ঠন আলো। টর্চের মত চতুর্দিক আলোকিত করে তুলবে এই কাঁচে মোড়া লণ্ঠন। জাহাজের সঙ্গে সংযোগ থাকবে একটি ইস্পাতের নলের দ্বারা। কথাবার্তা চলবে তারই মাধ্যমে।

জাহাজের মধ্যে চৌবাচ্চার মত ছোট্ট একটা ঘরে ওরা চারজন ঢুকতে ভেতরের দরজা প্রথমে বন্ধ হল। তখন খোলা হল বাইরের দরজা। হু হু করে সমুদ্র জলে ভরে গেল সে কেবিন।

ক্যাপ্টেন নেমো, প্রফেসর, কন্সেল ও নেড সমুদ্রতলের অপরূপ রাজ্যে নেমে গেল।

ডাঙার বন আর এ বনে অনেক তফাৎ। কি অদ্ভুত আকৃতি আর প্রকৃতি এই জল অরণ্যের লতাগুল্ম বৃক্ষাদির। আর কত রকমেরই না রঙের বাহার।

বিচিত্র আকৃতির ছোটবড় মাছ ও জীব জানোয়ার খেলে বেড়াচ্ছে সেই জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে। শিকার করবে কি, এরা তিনজন তাজ্জব হয়ে পরম বিস্ময়কর এ জগতের দৃশ্যাবলী দেখতে লাগলো।

সেদিন এভাবে কাটলো। এই শুরু এরপর মাঝে মাঝেই ডুবুরীর পোষাক পরে ওরা ঘুরে ফিরে, কখনো বা ছোটখাটো মাছ শিকার করে ফিরতে লাগলেন। সমুদ্রতলে পাহাড় পর্বত টিলা গহ্বর এমন কি টানেলও আছে। লালরঙের প্রবাল পাহাড় কী অপূর্বই না দেখতে। প্রকৃতির এই ভিন্নরূপ এখানে না এলে বিশ্বাসই হত না।

জাহাজ চলছে জলতলে। মাঝে মাঝে ওপরে ভেসে ওঠে বাতাস নেবার জন্যে। নটিলাস-এ কোন কিছুরই তো অভাব নেই। পৃথিবীর যাবতীয় সুখ সাচ্ছন্দই এর মধ্যে অধিকাংশে পাওয়া সম্ভব করেছেন কর্ম্মিৎকর্মা ক্যাপ্টেন নেমো।

জাহাজ এবার লঙ্কার কাছাকাছি।

এখানে ক্যাপ্টেন ওদের পোষাক ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নটিলাশ থেকে বের করে নিলেন একটা নতুন জিনিষ দেখাবার জন্য।

কি জিনিষ? না এখানকার কিছু লোক খালি গায়ে কোন পোষাক বা বাতাসের থলি ছাড়াই ডুব দিয়ে সমুদ্র জলে নেমে যায় মুক্তোর সন্ধানে।

সে কি করে সম্ভব? নিঃশ্বাস নেয় কি করে? ঐ তো মজা। মানুষের অসাধ্য কি আছে। অভ্যেসে কি না হয়। দম বন্ধ করে ওরা বহুক্ষণ জলের তলায় থাকতে পারে। ওপরের সঙ্গে একটা শেকলের বন্ধন নিয়ে ওরা অথৈ জলে নেমে গিয়ে মুক্তো তুলে নিয়ে আসে। কারুর কারুর সঙ্গে লম্বা নলও থাকে বাতাস নেবার জন্যে।

সেবার ওরা দেখলো একজন প্রায় উলঙ্গ মানুষ, কোমরে শেকল নিয়ে জলের নিচে নেমে গেল। ওরাও সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিল দেখবার জন্য কি প্রক্রিয়ায় লোকটা মুক্তো আহবণ করে।

এক সাংঘাতিক বিপদ ঘটলো পর মুহূর্তে। বিশালকায় এক হাঙর পেছন থেকে আক্রমণ করলো সেই অর্ধ-উলঙ্গ মানুষটাকে। চোখের পলকে গিয়ে লেজ দিয়ে এমন ঝটকা মারলো যে কোমর থেকে লোকটার শেকল ছিঁড়ে গেল। এখুনি অসংখ্য ধারালো দাঁত দিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে মুক্তো সন্ধানীকে।

নেড প্রস্তুত ছিল। হাতে ছিল তার তিমি মারা হার্পুন। বিদ্যুৎ-গতিতে সে এগিয়ে গেল হাঙরটার দিকে। মানুষটাকে বাঁচাতেই হবে জলদানবটার হাত থেকে।

হার্পুনের এক প্রচণ্ড আঘাতে দৈত্য হাঙর ফিরলো নেড-এর

পানে। একই সঙ্গে হার্পুন ও ক্যাপ্টেনের বর্শা আঘাত হানলো হাঙরটাকে। এবার ঘায়েল হল দানব। উঃ রক্তে রাঙা হয়ে উঠল সমুদ্রের নীল জল। কয়েকটা পাক খেয়ে গোঁত্তা মেরে মুমূর্ষু হাঙর জলের গভীরে তলিয়ে গেল মরতে।

ডুবুরি লোকটাকে লেজের ঝাপটায় রক্তাক্ত সংজ্ঞাহীন করে ফেলেছিল। তাকে ওরা ধরাধরি করে তুলে এনে পরিচর্যা করে সুস্থ করে তুলে ডাঙায় তুলে দিল। কৃতজ্ঞতায় লোকটির চোখে জল। সে তার আহরিত কয়েকটি মুক্তো ওদের দিতে চেয়েছিল। ওরা তা নেয় নি।

ডুবো জাহাজ নটিলাস চলছে। ভারত সাগর, লোহিত সাগর পার হয়ে এসে ঢুকলো ভূমধ্যসাগরে।

বন্দী অভিযাত্রীদের মনে আশার সঞ্চার হল। ইয়োরোপ এসে গেছে। এবার সুযোগ সন্ধান করে পালাতেই হবে। আর ভাল লাগছে না বিচিত্র অথচ অসহ্য এই বন্দী দশা।

একবার ভেসে উঠলেই চেষ্টা করতে হবে, ভাবে তিনজন।

কিন্তু এমনই বরাত। ভূমধ্যসাগরে জাহাজ ভেসে মোটে উঠলই না। একেই বলে বরাত। দিন যায় রাত্রি আসে। জাহাজ অবিরাম গতিতে চলেছে সমুদ্রতল দিয়ে।

এটা কোন সাগর ? ক্যাপ্টেন নেমো জবাব দেন, এটা অতলান্তিক মহাসাগর। এখন কোথায় চলেছি আমরা ?

উত্তর শুনে চমকে ওঠে ওরা। নটিলাস নাকি পাড়ি জমিয়েছে দক্ষিণ মেরুর দিকে। সর্বনাশ! সে যে বরফের রাজ্য। চির তুষার, চির হিমশীতল, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ স্থান দক্ষিণ মেরু। সেখানে যাবে কি মরতে ?

ক্যাপ্টেন নেমোর প্রাণে ভয়ডর বলে কোন বস্তু নেই। অভিযানে তাঁর আনন্দ। ভয়াবহ কিছুতে তার পুলক জাগে রোমাঞ্চ হয়। বরফের ভয় কি ? বরফ তো জলের উপরে ভাসবে। তার অনেক তলা দিয়ে যাবে এই ডুবো জাহাজ।

বেশ কদিন, প্রায় পনের ষোল দিন যাবার পর জাহাজ ভেসে উঠল একটা ফাঁক দিয়ে। চোখ ঝলসে গেল সবার। চারদিকে বরফ বরফ আর বরফ। সূর্যকিরণ তার উপর পড়ে চোখ ধাঁধাঁনো আলো বিকীরণ করছে। আর কি ঠাণ্ডা।

ফাঁক দিয়ে কিছুদূর যাবার পর দেখা গেল চারদিক থেকে বরফ এগিয়ে এসে জাহাজকে এমন আটকে ধরেছে যে তার নড়বার চড়বার জো নেই। আর একটু বেশী চাপ হলে নটিলাস গুঁড়িয়ে যাবে।

প্রমাদ গনলেন ক্যাপ্টেন নেমো। গাঁইতি নিল, কোদাল নিল, সবাই মিলে বরফের ওপর নেমে শাবল কোদাল কুড়ুল গাঁইতি দিয়ে বরফ কাটতে লাগলো। বেশ কয় ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রমের পর পথ সাফ হল। তারপর ফের ডুব দিল নটিলাস। সঙ্গে নিয়ে গেল প্রচুর পরিমাণ বাতাসভরা ট্যাঙ্ক। কেননা, কে জানে কতদিন থাকতে হবে এই বরফ ভাসা নিশ্ছিদ্র দক্ষিণ সমুদ্রে।

ক্যাপ্টেন নেমো দক্ষিণ মেরুতে যাবেনই। তাকে রোখে কে। অথচ এই তিন অভিযাত্রী বন্দীদের মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। এই বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন উন্মাদ মানুষটির খামখেয়ালে পড়ে পৈতৃক প্রাণটুকু না যায়।

একসময় নটিলাস উপরে ভেসে উঠলো। আহা মরি মরি, কি অপূর্ব দৃশ্য। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কি অসাধারণ রঙের খেলা। নয়নমন সবার পূর্ণ হল এই মধুর দৃশ্য দেখে।

সামনেই দক্ষিণ মেরু।

সকলে নামলেন সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত, অনাবিষ্কৃত মেরু প্রদেশে।

প্রথমে বোটে করে বরফের ফাঁকে ফাঁকে খালের মত পথ দিয়ে কিছুদূর যাবার পর প্রকৃত বরফের ডাঙায় উঠল ওরা চারজন।

সেখানে গিয়ে ক্যাপ্টেন নেমো একটি নিশান পুঁতলেন বরফে।

বক্তৃতার ঢং-এ বললেন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে তিনিই প্রথম মানুষ দক্ষিণ মেরুতে পদার্পণ করে তাকে জয় করলেন।

ফেরবার পথে আবার বিপদ।

বিরাটকায় ভাসন্ত বরফের পাহাড় চারদিক থেকে এসে পথ অবরোধ করে ফেলেছে। পিষে মারবার দাখিল। ক্যাপ্টেন নেমো ও বন্দীত্রয় শাবল কোদাল সহ নামলেন। বরফ কাটা চললো। কিন্তু সবই বৃথা। এত বরফ কাটা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

অথচ এ বরফ কবে সরবে জানা নেই। জাহাজে দু-চার দিনের মত আহার্য ও পানীয় রয়েছে। সর্বনাশ। এর বেশী দিন আটকে থাকতে হলে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়ই প্রাণ যাবে দেখছি।

হয়ে গেল। এবার বুঝি প্রকৃতি শোধ নিল। এবার বুঝি অনিবার্য মৃত্যু।

সহসা ক্যাপ্টেন নেমো বলে উঠলো, উপায় পেয়ে গেছি!

—কি সেটা? সকলের উদগ্রীব প্রশ্ন।

—গরম জল!

—গরম জল! সে কি!

—হ্যাঁ গরম জল করো, ক্যাপ্টেন নেমো নাবিকদের আদেশ দিলেন, প্রচুর পরিমাণ গরম জল করো। সেই গরম জল পাইপ দিয়ে তীর বেগে বরফের ওপর দিলে বরফ গলে গিয়ে রাস্তা হবে।

তাই করা হল। সত্যি সত্যি বরফ গলে অনেকটা রাস্তা হল। সামান্যর জন্য আটকে গেল।

তখন ঠিক হল জাহাজ চালিয়ে সজোরে ধাক্কা মেরে সে বাধাকে ভেঙে ফেলতে হবে। এদিকে নিঃশ্বাস নেবার বাতাস কমে এসেছে। যদি ভাঙা না যায় তাহলে দম বন্ধ হয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে কষ্টকর মৃত্যু হবে।

জাহাজের ইঞ্জিনে যত শক্তি আছে তাই দিয়ে সামনের বরফের পাহাড়ে মারা হল অকল্পনীয় ধাক্কা। ভেতরের যাত্রীরা সে ধাক্কায়

ছিটকে পড়ে অল্পবিস্তর জখম হয়ে গেল। এটাই শেষ চেষ্টা বাঁচবার।

উঃ ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন আমাদের। সবার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। বরফ ভাগ হয়ে গেছে সে প্রবল ধাক্কায়। আঃ পথ হয়ে গেছে। নটিলাস, পুনরায় তরতরিয়ে চলতে লাগলো তার যাত্রাপথে।

জাহাজ চলেছে।

বন্দী যাত্রীদের আর ভাল লাগছে না। পালানো চাই। অভিজ্ঞতা যত সুন্দর যত চমকপ্রদই হোক না কেন, বাড়ির মত স্বর্গ আর কোথায় আছে।

নেড ও কান্সেল পাগল হয়ে গেছে। যে ভাবেই হোক পালাবার চেষ্টা করতেই হবে। তাতে যদি মৃত্যু হয় সে মৃত্যুও শ্রেয়। সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালাবে ওরা এই স্থির করল।

কিন্তু সমুদ্রে বের হওয়া যে কি ভয়াবহ পরদিনই টের পেল ওরা।

অকস্মাৎ এক বিপর্যয়কারী ধাক্কা খেয়ে দুলে উঠলো নটিলাস। কিসের সঙ্গে ধাক্কা খেল? প্রবালের পাহাড়? না কি কোন……। পুরু কাঁচের জানালা দিয়ে দেখে তো ওদের রক্ত জল হয়ে গেল।

বিশালকায় এক দানব অক্টোপাস তার আটটি বাহু দিয়ে জাহাজ আক্রমণ করে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। জাহাজ দুলছে, কাৎ হচ্ছে। স্থির হয়ে এক সময় দাঁড়িয়ে গেল। কি ব্যাপার? সর্বনাশ। জাহাজের প্রপেলারের সঙ্গে একটা অক্টোপাশ জড়িয়ে গেছে। চারদিকে আরও অসংখ্য অক্টোপাস গিজ গিজ করছে। ছোট বড় মাঝারি ঘৃণ্য দানব এই অক্টোপাস।

বেশীক্ষণ থাকলে জাহাজকে কাহিল করে ফেলবে এরা। যার হাতে যা পেল সব অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হল সবাই।

ডেকের ওপরের কবাট ফাঁক করলেন ক্যাপ্টেন নেমো। অমনি অক্টোপাস স্প্রিং করে গলে ভেতরে ঢুকে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে কুড়ুল কোদাল দিয়ে সেটাকে শেষ করা হল।

আরেকটা···আবার আরেকটা অক্টোপাশ ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে এক এক জনকে নাগপাশে জড়িয়ে ধরে মেরে ফেলবার দাখিল করল। যাইহোক বহু চেষ্টায় সবাই মিলে দা কুড়ুল কাটারি শড়কি দিয়ে সেগুলোকে টুকরো টুকরো করে কেটে নিধন করা হল।

প্রপেলার মুক্ত করা হল। নটিলাস আবার তার যাত্রা শুরু করল। অক্টোপাসগুলো জাহাজের বহু যাত্রীকে রক্তাক্ত আহত করে রেখে গেছে।

নেড আর কন্সেল-এর অনুরোধে প্রফেসার আরোনাক্স সরাসরি একসময় গিয়ে উপস্থিত হলেন ক্যাপ্টেন নেমোর কেবিনে।

—বলুন ?

—আমাদের এবার বাড়ি ফেরবার অনুমতি আর ব্যবস্থা করে দিন। বাড়িঘর স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদছে। আমাদের মুক্তি দিন।

নিমেষে ক্যাপ্টেন নেমোর মুখ ক্রোধে লাল হয়ে উঠলো, মুক্তি! মুক্তি চাই তাই না? যান আমার কাছ থেকে। অন্যায় আব্দার করবেন না। আপনাদের নিমন্ত্রণ করে আনিনি। নিজেরাই এসে পড়েছেন নটিলাস-এ। এখান থেকে আর মুক্তি নেই আপনাদের।

—এটা আপনার কেমন কথা ক্যাপ্টেন। আমাদের শুধু শুধু আটকে রেখে আপনার কি লাভ বলুন? প্রফেসার বোঝাতে চেষ্টা করেন।

—কোন কথা শুনব না, কঠোর কণ্ঠে ক্যাপ্টেন নেমো বলেন, এই যে দেখছেন বড় ফাইলটা। এতে আমি আমার সমুদ্র ও সমুদ্রতলের যাবতীয় অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি নোট করে রাখছি ও রেখেছি। এটা হবে অমূল্য সামুদ্রিক দলিল। আমাদের মৃত্যুর আগে এটাকে সিল করা বাক্সে পুরে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। কোন না কোন সময় এটা ডাঙার মানুষের হাতে পড়বে এবং এর দ্বারা আপনাদের সভ্য জগৎ প্রকৃতই উপকৃত হবে।

—বেশ তো, আমাদের হাতে দিন এটা আমরাই দেশে নিয়ে প্রচার করব আপনার অভিজ্ঞতার কাহিনী।

—না। তা হয় না। আপানারও একই সূত্রে বাঁধা হয়ে গেছেন আমার সঙ্গে। আপনাদেরও নিস্তার নেই।

উপায় নেই। জলতলেই জলসমাধি হয়ে মরতে হবে একথা ভাবতে গিয়ে প্রফেসারের মনটা যারপরনাই দমে গেল।

নেড ও কন্সেল শুনে মহা খাপ্পা।

কিন্তু হাত পা কামড়ানো ছাড়া করবার আর কি আছে। ওরা একই কথা বললো, পালাতে হবে, ক্যাপ্টেন নেমোর অজ্ঞাতসারে। জ্ঞানত ব্যাটা ছাড়বে না। দেখা যাক সুযোগ আসে কি না।

সুযোগ এলো শিগ্রই দুর্যোগ নিয়ে। সমুদ্রে উঠলো ভীষণ ঝড়। নটিলাস ভাসমান ছিল। ভেঙে যায় আর কি তুফানের দাপটে।

বাধ্য হয়ে ডুব দিল অতল জলে। জলের গভীরে ঝড় বৃষ্টির মাতন পৌঁছয় না। সেখানে চিরশান্তি বিরাজ করে। হাওয়া নেই, বাতাস নেই, আলো নেই, শান্ত গভীর নীল ও নোনতা জল।

এবার জলে ডুবে এক পরমাশ্চর্য দৃশ্য দেখলো ওরা। ক্যাপ্টেন নেমোর আহ্বানে ওরা ডুবুরির পোষাক পরে জলে নামলেন।

হেঁটে চললেন। সামনে এক লাল রঙের পাহাড। তাতে চড়লেন ওরা। আগ্নেয় পাহাড়। তার ওপাশে এক ডুবন্ত নগরী। নাম আটলান্টিশ। লস্ট সিটি।

প্রবাল পাহাড়, জঙ্গল, থাম, প্রাচীর, এক ডুবন্ত হারিয়ে যাওয়া নগরীর ধ্বংসাবশেষ। এককালের ঐশ্বর্যময় জনপদের সলিল সমাধিস্থ অবস্থা।

জাহাজ ফের চললো অনির্দিষ্ট পথের সন্ধানে।

এর মধ্যে বাতাস নেবার জন্য নটিলাস বারেক উঠেছিল ভেসে। সে সময় তিন বন্দী দেখলো বহু দূর দিয়ে এক জাহাজ যাচ্ছে।

ভাবলো এই তো মুক্তির সুযোগ। ওরা রুমাল নেড়ে জাহাজটার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকল।

এমন সময় ক্যাপ্টেম নেমোর আগমন সেখানে। রেগে মেগে গর্জন করে ওদের ফের নিচে নামিয়ে কেবিনে ঢুকিয়ে দিলেন।

আর পরক্ষণে করলেন সেই প্রলয়ংকরী কাণ্ডটি। নটিলাস কিসে যেন প্রচণ্ড আঘাত হানলো। পরক্ষণে মনে হল, প্রলয়।

সেই চলন্ত জাহাজকে নটিলাস খতম করে ডুবিয়ে দিল তার অসংখ্য যাত্রীসহ। কতগুলো নিরীহ প্রাণ গেল। নিষ্ঠুর স্বভাব ক্যাপ্টেন নেমো বুঝি বীভৎস আনন্দ লাভ করে এই ধরনের ঘটনায়।

জাহাজ ফের চললো।

এরপর প্রকৃতই সুযোগ এল বন্দীত্রয়ের। এক রাত্রে জাহাজ সমুদ্রবক্ষে ভাসছে। প্রফেসার, নেড ও কন্সেল চুপিসারে পাটাতন-এর ডালা খুলে ডেক-এ চলে এল।

নটিলাসে সবাই তখন ঘুমুচ্ছে। গভীর রাত। গায়ে বাঁধা রয়েছে একটি ছোট্ট নৌকো। তাতে ওরা তিনজন চড়ে বসলো। নৌকো ছাড়তে শুরু হল আরেক বিপদ। আকাশ চিরে বিদ্যুৎ, বজ্রধ্বনী, প্রবল বেগে বাতাস বইতে শুরু করে এক সময় ভয়ংকর তুফান আরম্ভ হল।

হায় হায় এই গভীর অন্ধকার রাত, ছোট্ট নৌকো, অকুল পাথার, তাতে প্রবল ঝড়। ঈশ্বরের বোধ করি ইচ্ছে নেই ওরা মুক্তি পায়। নয়ত দুর্লভ সুযোগ এল তখন কিনা এই বিপত্তি।

বিশাল আকাশ ছোঁয়া ঢেউ কাটিয়ে ওরা তিনজনে প্রাণপণে নৌকো বেয়ে চলেছে। সে এক ভয়াবহ রাত। বহুকষ্টে ওরা এক সমুদ্রে আধা জাগা পাহাড়ে এসে পড়লেন। তবু বাঁচোয়া এই মুহূর্তে প্রাণে বাঁচবেন। পাগলা সমুদ্র থেকে এতো কঠিন এক আশ্রয় তো বটে।

এক সময় অন্ধকার রাত এবং প্রবল তুফান শেষ হল।

সকালে উঠে বহু দূরে একটি বস্তু দেখে ওরা দূরবীন চোখে দিয়ে দেখলেন। আরে! এযে নটিলাস। কাত হয়ে জলে ভাসছে! একটা দিক খাড়া আকাশ পানে উঠে আছে।

এতদিনে বুঝি ক্যাপ্টেন নেমোর অমর সৃষ্টি নটিলাস শেষ হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন ও তার নাবিক দলের অভিযানও বুঝি শেষ হয়ে গেল। কে জানে বেঁচে আছে কিনা। নটিলাসের অবস্থা দেখে তো মনে হয় সব শেষ হয়ে গেছে।

তাহলে সেই অভিজ্ঞতার মূল্যবান দলিলের কি হল? প্রফেসার আরোনাক্স মনে মনে ভাবলেন, কে জানে সেটাও হয়ত ধ্বংস হয়ে গেল ওদের সঙ্গে।

মানব জাতির মহা উপকার হবে বলে ক্যাপ্টেন নেমো যে আশা প্রকাশ করেছিলেন তা আর হল না।

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল প্রফেসরের।

ওরা তিন জন পাহাড়ের পাশে বালুকাভূমি দিয়ে পথ হাঁটতে লাগলেন। বাড়ি তো ফিরতে হবে।

রাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ

(এ কাহিনী ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের। তখন আজকের মত দ্রুতগতিসম্পন্ন কোন নভোযান বা যান বের হয় নি। পৃথিবী ঘুরে আসতে বেশ কয়েক মাস সময় লাগতো। সে কালে মাত্র আশি দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিন করা একদিকে ছিল যেমন অবিশ্বাস্য অন্যদিকে ছিল অতি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। সেই গত শতাব্দীর মন নিয়ে পড়তে হবে এ কাহিনী।)

* * * *

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ। স্থান লণ্ডন।

এ কাহিনীর নায়ক ফিলিয়াস ফগ এক অদ্ভুত ধরনের অতি নিয়মনিষ্ঠ রহস্যময় পুরুষ। বয়েস বছর চল্লিশের কিছু বেশী।

একটি অভিজাত বাড়িতে একমাত্র ভৃত্য নিয়ে একাই কাটাতেন। বিবাহ করেন নি।

জীবনযাত্রা ছিল বড় অদ্ভুত। বেলা সাড়ে এগারটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত কাটে রিফর্ম ক্লাবে। বিচিত্র পেশার অভিজাত মানুষ এই ক্লাবে সময় কাটান। ফগ সেখানেই প্রাতঃরাশ থেকে রাত্তিরের ডিনার পর্যন্ত সেরে গভীর নিশীথে বাড়ি ফেরেন ঘুমবার জন্য। এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম কেউ দেখেনি।

রহস্যময় মানুষ এই ফগ। সারা পৃথিবীর মানুষের আচার আচরণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা তাঁর মুখস্থ। বিশ্বের যাবতীয় ঘটনার আতিপাতির সন্ধান তাঁর নখাগ্রে। দূর থেকে বিশেষ বিশেষ ঘটনার এমন সব ব্যাখ্যা করেন, যা হুবহু মিলে যায়। অদ্ভুত দূরদৃষ্টি তথা দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ এই ফিলিয়াস ফগ।

লোকটির জীবন যাপন এবং খবর পত্রাদির উদারতায় বোঝা যায় ইনি অবশ্যই অতি ধনাঢ্য ব্যক্তি। কিন্তু সে ধন কোথা থেকে আসে, বা এর উপার্জ্জনই বা কি কেউ তা জানে না। দান ধ্যানেও দরাজ হাত।

আর এমন নিয়মনিষ্ঠ লোক যে অতি পুরাতন ভৃত্য জেমস ফস্টারকে তুচ্ছতম কারণে চাকরী থেকে বরখাস্ত করে দিলেন। দাড়ি কামানোর জলের উত্তাপ দু-ডিগ্রী কম ছিল এই ছিল চাকরের কসুর।

যেদিন নতুন এক ভৃত্য চাকুরীতে এল সেদিনই যাত্রা শুরু। অর্থাৎ ফরাসী চাকর জাঁ পাসেপার্ত সকালে এল রাত্রেই যাত্রা শুরু হল মনিবের সঙ্গে পৃথিবী প্রদক্ষিণ।

ঘটনার শুরু বাজি ধরে।

রিফর্ম ক্লাবে ফিলিয়াস ফগের তাসের আড্ডা ছিল। সেই অভিজাত বন্ধুদের সঙ্গে প্রথমে শুরু হল সদ্য হওয়া ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড ডাকাতির সংবাদ দিয়ে।

আশ্চর্য এক ডাকাতি হয়েছে ব্যাঙ্কে। আসামী একেবারে হাওয়া। তবে দিগবিদিকে, দেশে দেশে ডিটেকটিভ পাঠানো হয়েছে পলাতক আসামীর সন্ধানে। নগর বন্দরে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

তারপর আলোচনা বাঁক নিল পৃথিবী ক্রমে ছোট হয়ে আসছে, এই বলে। আগে বিশ্ব পরিক্রমায় সময় লাগত দু-তিন বছর, বর্তমানে লাগে মাস ছয়েক।

ফিলিয়াস জানায়, উহুঁ মাত্র আশিদিনে ঘুরে আসা সম্ভব, 'মর্নিং ক্রনিকল' পত্রিকার সেই হিসেবটি দেখ।

পত্রিকা খুলে দেখা গেল লেখা আছে :

লণ্ডন থেকে সুয়েজ বন্দর (রেলে ও জাহাজে)	৭ দিন
সুয়েজ বন্দর থেকে বোম্বাই (জাহাজে)	১৩ দিন
বোম্বাই থেকে কলিকাতা (রেলে)	৩ দিন
কলিকাতা থেকে হংকং বন্দর (জাহাজে)	১৩ দিন
হংকং বন্দর থেকে ইয়োকোহামা (জাহাজে)	৬ দিন
ইয়োকোহামা থেকে সানফ্রান্সিস্কো (জাহাজে)	২২ দিন
সানফ্রান্সিস্কো থেকে নিউইয়র্ক (রেলে)	৭ দিন
নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডন (জাহাজ ও রেলে)	৯ দিন
	মোট ৮০ দিন

তাসের বন্ধুরা হেসে উঠল পড়ে। পাগলের প্রলাপ। দূর দূর এও নাকি সম্ভব। গাঁজা কাহিনী। ছেড়ে দাও ভাই এ সব অলীক কথা।

কিন্তু সহসা ফিলিয়াস ফগ কঠোর কণ্ঠে বাজী ধরে বলে সে এই আশি দিনেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে সক্ষম। এ জন্যে বিশ হাজার পাউণ্ড বাজী ধরলাম। আজ ২রা অক্টোবর বুধবার আমি যাত্রা শুরু করব এবং আগামী ২১ শে ডিসেম্বর শনিবার রাত ৮-৪৫ মিঃ ৮০ দিনে বিশ্ব পরিক্রমা করে তোমাদের এই রিফর্ম ক্লাবের ঘরে এসে প্রবেশ করব। রাজী ?

রাজী। ফগ বিশ হাজার টাকার একটা চেক লিখে বন্ধু পাঁচ জনের হাতে দিল। সে যদি ৮০ দিনে সক্ষম না হয় তো চেক ভাঙিয়ে ওরা টাকা নিয়ে নেবে। একটা লেখাপড়াও হল।

বাড়ি এসে নতুন ফরাসী ভৃত্য পাসেপার্তুকে সংবাদটি জানাতে বিস্ময়ে সে হতবাক হল। আজই রাত ৮-১৫-তে নাকি পৃথিবী পর্যটনে যেতে হবে। পাগল নাকি তার মনিবটি।

সঙ্গে একটা ব্যাগ, দুটো সার্ট ও তিন জোড়া মোজা—ব্যস।
সঙ্গে নেওয়া হল অজস্র অর্থ বিশ হাজার পাউণ্ড। যখন যেখানে যা
প্রয়োজন কিনে নেওয়া হবে।

বেরিং ক্রশ স্টেশন থেকে ডোভারের দুখানা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট
কিনে গাড়িতে বসলো। বন্ধুরা এসেছিলেন সী-অফ করতে। ফগ
তাদের আশ্বস্ত করে জানালে, যেখানেই যাব সেখানকার ব্রিটিশ
কন্সালের কাছে ভিসা করিয়ে নেব পাশপোর্টে যাতে প্রমাণ হবে
আমি সেই সেই দেশে প্রকৃতই গিয়েছি।

আটটা পঁয়তাল্লিশে ট্রেন ছাড়লো। শুরু হল বিশ্ব ভ্রমণের যাত্রা।

পরদিন এ সংবাদ পত্রিকা মারফৎ দিকে দিকে প্রচারিত হতে
কেউ অবাক মানলো, কেউ অবিশ্বাসের হাসি হাসলো, কেউ টিটকারী
দিল। ওকে নিয়ে আবার প্রাইভেট বাজী ধরা, জুয়া খেলা শুরু
হয়ে গেল। অধিকাংশ লোকের মতেই একাজ পাগলামী ছাড়া
কিছু নয়।

ওরা রওনা হবার পরে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে পুলিশের কাছে সুয়েজ
বন্দর থেকে এক তার এল সদ্য ব্যাঙ্ক ডাকাতির জন্য তথায় যাওয়া
ফিক্স নামের একজন ডিটেকটিভের কাছ থেকে—ফেরৎ ডাকে
গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পাঠাবেন। ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডের ডাকাতির
আসামী ফিলিয়াস ফগকে এখানে পাওয়া গেছে।

লণ্ডনে আবার হৈ চৈ পড়ে গেল। তাহলে ফগ আদৌ
পর্যটনকারী নয়। একজন ডাকাত মাত্র। টাকা নিয়ে দেশান্তরী
হয়ে পালাচ্ছে। হু হু করে বাজীর দর কমে গেল। রিফর্ম ক্লাবের
তাসের অভিজাত বন্ধুরাও বিস্মিত ও দুঃখীত কম হলেন না। আবার
আনন্দিতও হলেন। যাক বিশ হাজার পাউণ্ড এবার তারা জিতে
গেল। ফগের কপালে তো গ্রেপ্তার এবং জেল অনিবার্য।

ফিলিয়াস ফগ যে জাহাজে যাচ্ছে তার নাম মঙ্গোলিয়া। সুয়েজে
ভেড়বার আগে তথায় উপস্থিত ডিটেকটিভ ফিক্স ওখানে মতলব

ভাঁজছিলেন কি ভাবে আসামী ধরা যায়। প্রতিটি জাহাজে সে উঠে উঠে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সন্ধান করছে সন্দেহভাজন ব্যক্তির।

মঙ্গোলিয়া জাহাজ ভিড়তে ফিক্স জাহাজে গিয়ে উঠল। কিছুক্ষণ বাদেই ছুটে নেমে এল ব্রিটিশ কন্সালের কাছে। জানালে আসামীর বর্ণনার সঙ্গে একজন যাত্রীর চেহারা হুবহু মিলে গেছে নাম ফিলিয়াস ফগ। ওকে এখানে ভিসা করবার মুখে আটকে দিন, আমি লণ্ডন থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আনিয়ে ওকে পাকড়াও করি।

কিন্তু কন্সাল রাজি হলেন না এই বে-আইনী প্রস্তাবে। জাহাজ চার ঘণ্টা থাকবে, তার বেশী কোন যাত্রীকে শুধু সন্দেহের বসে বিনা অপরাধে আটকে রাখা সম্ভব নয়।

ডিটেকটিভ ফিক্স নিরুপায় হয়ে তখন সংবাদ আহরণের জন্য ফগ-এর ফরাসী ভৃত্য পাসেপার্তুকে বাজারে ধরে আলাপ জমিয়ে ফেললো।

এক ফাঁকে সে লণ্ডন পুলিশকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা পাঠাবার জন্য টেলিগ্রাম করে দিয়ে এসেছে।

ফরাসীরা এমনিতেই বেশী কথা বলে। ছুচার কথায় অনেক কিছু বলে গেল ভৃত্যটি অজানা ডিটেকটিভকে। তার মনিব আশি দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে বলে বেরিয়েছে। সে সবে যাত্রার দিনই চাকরীতে নিযুক্ত হয়েছে। হ্যাঁ প্রচুর পয়সা আছে মনিবের। না, রোজগারপাতি কি ভাবে হয় তা সে জানে না। দূর দূর দেশ ভ্রমণ তার আদৌ ভাল লাগে না। চাকরী করতে ঢুকে কি ফ্যাসাদেই না পড়ে গেল সে।

ডিটেকটিভের সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হল নিশ্চয়ই এ ব্যক্তি ডাকাতির আসামী। টাকা নিয়ে দেশ ভ্রমণের নামে হাওয়া হয়ে যাবার ফিকিরে আছে। দেখা যাক কি ভাবে ঘুঘুকে ফাঁদে ফেলা যায়। ওয়ারেন্টটা এলে বাঁচি।

হায় পরোয়ানা এল না। জাহাজ ছাড়বার সময় হল। আসামীকে

হাতছাড়া করা উচিত নয় কোন মতেই। অতএব ফিক্স স্থির করল সেও যাবে জাহাজে করে বোম্বাই। আর সেখানেই ওকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করতে হবে।

মঙ্গোলিয়া চলেছে—লোহিত সমুদ্র দিয়ে। ফগ জাহাজের ক্যাপ্টেনকে লোভ দেখিয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের আগে যদি বোম্বাই পৌঁছে দিতে পারে তো প্রচুর বকশিস দেবে। তাই জাহাজও ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রবল ঢেউ সমূহকে অগ্রাহ্য করে হু হু করে চলেছে সমুদ্র কেটে।

নানা দেশের নানা ধরনের যাত্রী জাহাজে। পর্তুগীজ অফিসার স্কটিশ পাদরী ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ এরা কেউ যাবে গোয়া, কেউ যাবে বোম্বাই, কেউ বেনারস। তাস্বুড়ে ফগ এদের নিয়েও তাসের আড্ডা জমায়।

পাসেপার্তুর সঙ্গে এক সময় দেখা হয় ডিটেকটিভ ফিক্স-এর জাহাজের ডেক-এ। ভারতবর্ষ দেখেছেন? হ্যাঁ দেখেছি। কেমন দেশ সেটা? বিচিত্র দেশ, সাপ বাঘ কুমীর সিংহ হাতি গণ্ডার ফকীর সন্ন্যাসী মন্দির মসজিদ গীর্জা কিনা আছে সেখানে।

এ কথা সে কথায় ডিটেকটিভ ভৃত্যটির কাছ থেকে কথা বের করবার চেষ্টা করে। কিন্তু নতুন চাকর সব সংবাদ জানে না। ফিক্স অবশ্য কড়া নজর রেখে চলেছে সন্দেহজনক ব্যক্তিটির প্রতি। লোকটা এতটা নিস্পৃহ হল কি করে। কোন কিছুতেই খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না। কেবিনেই থাকে দিনরাত। সমুদ্র-পীড়ায়ও কাবু হয় না।

বকশিসের লোভেই হোক আর যে জন্যই হোক এডেন বন্দরে ১৪।১৫ ঘণ্টা পূর্বেই পৌঁছলো জাহাজ।

এ বন্দরে অপরাপর দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে আছে রাজা সলোমনের একাধিক চৌবাচ্চা।

অবশেষে বোম্বাই এবং সময়ের দুদিন আগে। পাকা আটচল্লিশ ঘণ্টা বাঁচিয়েছে জাহাজের ক্যাপ্টেন। ফগ খুব খুশী।

বোম্বে থেকে এলাহাবাদ হয়ে কলকাতা। ট্রেন ছাড়বে সন্ধ্যে

আটটায়। ফগ-এর কাজ কন্সালের সঙ্গে দেখা করে ভিসা করা। আর ভৃত্য বের হল শহর দেখতে। কতকিছু দেখবার আছে। সিটি হল, কেল্লা, ডক, সমুদ্রতীর, ইহুদি মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা, মালাবার পাহাড়।

ফিক্স আছে নিজের তালে। নেমেই সোজা পুলিশ অধিকর্তার কাছে। পরিচয় দিয়ে জানতে চায় কোন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এসেছে কিনা ফিলিয়াস ফগ নামক এক ডাকাতের নামে। লণ্ডন থেকে এমন কিছু আসেনি শুনে হতাশ হল। আপনারা গ্রেপ্তার করুন না কেন। আমরা তা পারি না। হতাশ হল ডিটেকটিভ। হাতে পেয়ে পাখী উড়ে যাবে! অথচ ধরা পড়লে যত পাউণ্ড উদ্ধার হবে তার উপরে একটা কমিশন সে পেত। উঃ কি নিদারুণ ক্ষতি।

এদিকে পাসেপার্তু এক ফ্যাচাং বাঁধিয়ে মারধোর খেয়ে স্টেশনে ফিরে এল। সে গিয়ে জুতো সুদ্ধ এক মন্দিরে প্রবেশ করে। ব্যস, পুরোহিত তিনজন তাকে বেধড়ক প্রহার দিতে শুরু করে। পাসেপার্তুও বলবান তবে তিনজনের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন। জুতো ফেলে জামা ছিঁড়ে দৌড়ে সে প্রাণ বাঁচায়।

ফিক্স দূর থেকে সবই শুনলো। সে প্ল্যান করল এই হিন্দু মন্দিরের অবমাননার দায়ে এদের ফ্যাসাদে ফেলে আটকাতে হবে। তাই এদের সঙ্গে তখনই সে ট্রেনে গেল না। পরে গিয়ে এদের কলকাতা পাকড়াও করবে। ইংরেজরা কখনো ধর্মীয় অবমাননা সহ্য করে না।

ট্রেন বোম্বাই ছেড়ে গেল। মনিব ভৃত্য ছাড়া সে কামরায় আরেকজন যাত্রী যাচ্ছিলেন। তিনি হলেন বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট-এর সেনাপতি স্যার ফ্রান্সিস ক্রোমাটি।

ক্রোমাটির সঙ্গে জাহাজ থেকেই পরিচয়। এর মতে নির্দিষ্ট সময়ে বিশ্ব পরিক্রমা দুঃসম্ভব। কত কিছু অজ্ঞাত বাধা-বিপত্তি আসতে পারে পথে। ইনি বললেন, যেমন আপনার ভৃত্যটির হিন্দু

মন্দিরে যে অপরাধ করে এসেছে এতে সে ধরা পড়লে সাংঘাতিক ঝঞ্ঝাটে পড়তেন। যাত্রাও পিছিয়ে যেত।

রহস্যময় পুরুষ ফগ জবাব দেয়, পাসেপার্তুকে ধরে জেল দিলে সে জেল খাটতো কিন্তু ফগ তার জন্যে পথ চলা এক মুহূর্তও বন্ধ করতেন না।

সুন্দর দেশ, সুন্দর দৃশ্য এই ভারতবর্ষের। ধোঁয়া উড়িয়ে রেল চলেছে দুদিকের মনোরম প্রাকৃতিক শোভার মধ্য দিয়ে। কোথাও গভীর জঙ্গল আসছে, শ্বাপদসংকুল বন।

রেল চললো ঠগেদের রাজ্য দিয়ে। ইলোরা ও ঔরঙ্গাবাদের মাঝখানে এই বিভীষিকাময় ঠগ সর্দার ফিরিঙ্গীর রাজ্য প্রচুর নরহত্যা করে চলেছে এই দস্যু-তস্করের পাল। ইংরেজরাও এদের বশে আনতে বা সায়েস্তা করতে সক্ষম হয় নি।

পাসেপার্তুর ঘড়ি নিয়ে হয়েছে মুস্কিল। উদ্ভট টাইমে সূর্যোদয় হয় সন্ধ্যে হয়। ব্যাপার বোঝে না সে।

স্যার ফ্রান্সিস-এর কাছে সবিস্তারে শুনে তবে জ্ঞান হয়। লণ্ডনের সঙ্গে মেলানো ঘড়ি, ভারতে মিলবে কেন। ওখানকার সঙ্গে কমসে কম চার ঘণ্টার তফাৎ হবে। পুবদিকে অগ্রসর হচ্ছে ওরা। যত যাবে তত সময় বেড়ে যাবে। তাই স্থানীয় সময়ের সঙ্গে মিল করে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিতে হবে।

সকাল বেলা রোথাল নামক স্থানের কয়েক মাইল আগে ট্রেন থেমে গেল। গার্ড নেমে যাত্রীদের নেমে পড়তে অনুরোধ করল। কি ব্যাপার? কোন দুর্ঘটনা হয়েছে নাকি? কি কারণে গাড়ি থামলো।

শুনে অবাক হল ফগ, এর পরে আর রেলপথ তৈরী হয় নি। সে কি! হ্যাঁ এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল অন্য যে কোন যানে গিয়ে এলাহাবাদ পৌঁছুতে হবে, সেখান থেকে ফের রেলপথ কলকাতা অবধি গেছে।

আশ্চর্য তো। এদিকে ঝামেলা হল। যারা জানতো এমন সব

যাত্রীরা আগে-ভাগে নেমে গিয়ে এই খেলবি গ্রামে অবস্থিত পাল্কি ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি, রথ, পাল্কি, ঘোড়া বা টাট্টু, যে যা পেয়েছে ভাড়া করে নিয়ে এলাহাবাদের পথে রওনা হয়ে গিয়েছে।

ওরা তিনজন গিয়ে দেখলো কোন যানবাহন নেই। সর্বনাশ। উপায়? অবশ্য জাহাজে আসতে দুদিন বাঁচানো গেছে। সে দুটি দিন এখনো হাতে আছে। তবু পশ্চাশ মাইল পথ চাট্টিখানি কথা নয়। হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়।

শোনা গেল এখানে একটি হাতি আছে। তাই সই। হাতিই চাই। তাতেই চলবে। কিন্তু হাতির মালিক জানায় সার্কাসের জন্য এ হাতির ট্রেনিং দিচ্ছে, এ হাতি ভাড়া যাবে না। ফগ টাকা বাড়াতে বাড়াতে ভাড়া হিসেবে ছয়শো পাউণ্ড পর্যন্ত দিতে চাইল। তাতেও রাজি নয় হাতির মালিক।

—ঠিক আছে আমি কিনে নেব এই হাতি, দাম দিচ্ছি দু-হাজার পাউণ্ড।

হাতি কিনে মাহুত হিসেবে পার্শী একটি ছেলেকে পাওয়া গেল। হাওদা তৈরী করে একপাশে সেনাপতি অপর পাশে ফগ, মাঝখানে রইল ভৃত্য। হাতি চলতে আরম্ভ করল। বিচিত্র করুণ এবং বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা। দোলানীতে হাড়গোড় ভেঙ্গে যাবার দাখিল।

বন-জঙ্গল-প্রান্তর দিয়ে হাতি চলছে। জংলা পথে প্রায় কুড়ি মাইল পথ কমে যাবে।

অরণ্যপ্রান্তর ঘেরা বুন্দেলখণ্ড দিয়ে ওরা চলেছে। পার্শী ছেলেটির মুখে শোনা গেল এখানকার অধিবাসীরা গোঁড়া হিন্দু। আচার আচরণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে চরম নৃশংস কাজ করে এরা। ইংরেজ শাসনেও এদের বিশেষ কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

বিন্ধ্য পর্বতের পাশ দিয়ে চলেছে ওরা। গ্রামের বাইরে দিয়ে যাওয়াই নিরাপদ তাই যাচ্ছে হাতি।

এলাহাবাদের বারো মাইল আগে সহসা ওরা দূরে একটা

বাদ্যভাণ্ড সহ বিচিত্র কলরবে একটা মানুষের মিছিল আসছে দেখতে পেল।

পার্শী যুবক জানে এখানকার গোঁড়া হিন্দুদের মতিগতি, তাই হাতি নিয়ে পাশের জঙ্গলে লুকিয়ে পড়লো। কি ব্যাপার কে জানে?

কিছুক্ষণের মধ্যে এসে গেল মিছিল। ওরা গাছের ফাঁক থেকে দেখতে লাগলো, প্রথমে চলেছে জরিদার পোষাক ও মাথায় পাগড়ী বাঁধা একদল পুরোহিত। পেছনে আবালবৃদ্ধ নরনারী। সবাই কি যেন মন্ত্র পড়তে পড়তে যাচ্ছে। কানফাটা বাদ্যভাণ্ড মাঝে মাঝে বেজে উঠছে। তার পেছনে রথ। তাতে রয়েছে কালীমূর্তি।

দেবীর চারদিকে সাধু-সন্ন্যাসীরা নাচতে নাচতে চলেছে। নিজেদের দেহ ছুরির দ্বারা রক্তাক্ত করে ফেলেছে তারা।

এরপর কতগুলো ব্রাহ্মণ একটি সুন্দরী শ্বেতকায়া নারীকে নিয়ে আসছে। সুন্দর পোষাক ও হীরে-মুক্তোর অলঙ্কার সর্বাঙ্গে।

অবশেষে সৈন্য পরিবেষ্টিত একটি পাল্কিতে আসছে শোয়ানো একটি জমকালো পোষাক পরিহিত মৃতদেহ। তলোয়ার, মুকুট ও স্বর্ণালঙ্কারভূষিত সেই শবদেহ।

পেছনে শোকাকুল গ্রামবাসী ও বাদ্যকরের দল বিকট চীৎকার ও বিকটতম বাদ্যভাণ্ড বাজিয়ে চলেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মিছিল পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কি ব্যাপার ফিলিয়াস ফগ প্রশ্ন করে। স্যার ফ্রান্সিস জানালেন, একটি সহমরণ হতে চলেছে। মেয়েটি সতী। তাকে স্বামীর মৃতদেহের সঙ্গে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে এরা।

শিউরে উঠল ফগ ও পাসেপার্তু। সেনাপতি জানালেন ঐ যে মৃতদেহ ওটি হল বুন্দেলখণ্ডের এক স্বাধীন রাজার। ব্রিটিশ আমলেও এ বর্বর প্রথা লুপ্ত হয়নি পুরোপুরি।

মেয়েটিকে গাঁজা আফিমের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে নিয়ে চলেছে অর্ধচেতন অবস্থায়।

প্রথমে ওরা যাবে ছ-মাইল দূরের পিলাজির মন্দিরে, কাল সকালে হবে সতীবধ বা সতীদাহ।

সহসা ফিলিয়াস ফগ গরম হয়ে উঠল। যে করেই হোক অভাগিনীকে বাঁচাতে হবে। ছি ছি এ কি বর্বর প্রথা। পার্শী যুবকটির মুখে শোনা গেল মেয়েটিও পার্শী। বোম্বাইয়ের ধনী পরিবারের মেয়ে ছিল, ইংরেজী স্কুলে ইয়োরোপীয় ধরণের শিক্ষা পেয়ে মানুষ। সুন্দরী হিসেবে রাজার ঘরণী হয়েছিল। মাস তিনেক আগে মাত্র বিয়ে হয়েছে। মা-বাবা না থাকায় এই দুর্দশা। আত্মীয়রা টাকা খেয়ে এই অপকর্ম করেছে। মেয়েটির নাম আউদা।

রাত্রিবেলা মেয়েটি থাকবে মন্দিরের মধ্যে। সকাল হলেই সহমরণ।

ফগ শপথ করে ফেলেছে যে করেই হোক মেয়েটিকে উদ্ধার করে সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে।

রাত্রির অন্ধকারে পেছন পথে বহু চেষ্টা করল মন্দিরে ঢুকে মেয়েটিকে উদ্ধার করবার। কিন্তু সফল হল না। উপায় কি সকাল পর্যন্তই অপেক্ষা করতে হল।

সে রাতেই নদীর তীরে একটা স্তূপ দেখে এগিয়ে গেল ওরা। আরে এ যে চিতাশয্যা। রাজাকে শুইয়ে রাখা হয়েছে সুগন্ধী চন্দন কাঠের মধ্যে। গন্ধ তেল ঢালা হয়েছে। প্রহরীরা মশাল হাতে পাহারা দিচ্ছে। সকাল হলে আউদাকে এনে চিতায় অগ্নি প্রদান করা হবে। কী বীভৎস প্রক্রিয়া। জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা।

ফিলিয়াস ফগ সহসা ভৃত্য পাসেপার্তুকে এক পাশে ডেকে তাকে কানে কানে কি যেন বললো। পাসেপার্তুও হাসিহাসি মুখ করে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। তারপর কোথায় যেন সরে গেল।

রাত শেষে ভোর হল। পুরোহিত ব্রাহ্মণ এবং জনতার উচ্চকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ, চীৎকার, বীভৎস উল্লাসে স্থানটা ভরপুর হয়ে উঠল।

সবাই বেরিয়ে এসে চিতার দিকে গেল। পেছন পেছন নিয়ে এল সেই রূপসী বেচারী মেয়েটিকে। জোর করে সবাই নিয়ে যাচ্ছে তাকে চিতার দিকে। আতঙ্কে মেয়েটির চোখ ফেটে রক্ত বের হবার দাখিল।

নাকে কি একটা শোঁকালো অমনি মেয়েটি প্রায় অচেতন হয়ে গেল। তাকে ধরাধরি করে এনে ওরা চিতার পাশে শুইয়ে দিল।

বাদ্যভাণ্ড হুঙ্কার গর্জন চীৎকার সব মিলে কানফাটা ধ্বনি। চিতায় আগুন ধরিয়ে দিল কে যেন। বিরাট জনতা সেখানে উপস্থিত।

চিতায় অগ্নি ধীরে ধীরে ধরে উঠছে। সাহেবরা নদী পার হয়ে জনতার পেছনে এসে উপস্থিত হল। ফগ বেশ সশস্ত্র। ছুরি হাতে কোমরে রিভলবার।

মন্ত্রপাঠ, সুগন্ধী তেল ঢালা, বিকট বাজনা। এর মধ্যে কজন পুরোহিত রূপসী মেয়ে আউদাকে ধরাধরি করে চিতায় দেবার জন্যে নিতে চললো।

ঠিক সে সময়েই ভয়াবহ ঘটনা ঘটলো।

উপস্থিত জনতা ভয়ে আতঙ্কে প্রথমটা নাচানাচি লাফালাফি বন্ধ করল, স্তব্ধ হল বাদ্যভাণ্ড, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণরা কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে কাঁপতে লাগলো। তারপর মাটিতে প্রণামের ভঙ্গিতে নিচু হয়ে ঈশ্বরের নাম সভয়ে উচ্চারণ করতে থাকলো।

দাঁড়িয়ে ছিল শুধু তিনটি মানুষ তারা হল ফিলিয়াস ফগ, স্যার ফ্রান্সিস ও মাহুত ছেলেটি।

ঘটনা ভয়াবহ। চিতায় মৃত রাজা উঠে বসেছে। সেই মুকুট, সেই হীরা-জহরৎখচিত রাজপোষাক নিয়ে তিনি চিতার উপর শুধু বসে নেই, নেমে এসে মাটিতে শোয়ানো আউদাকে কোলে করে উপুড় হওয়া জনতার মধ্য দিয়ে হেঁটে গিয়ে নদী পার হয়ে অপর পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল।

ফগ, ফ্রান্সিস এবং পার্শী ছেলেটিও এসে সে পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আসলে জনতা ভেবেছে রাজা মরেনি যে ভাবেই হোক তিনি আবার বেঁচে উঠেছেন। না কি এটা রাজার প্রেতাত্মা! ভয়ে ওরা উপুড় হয়ে মন্ত্র পাঠ ও মা কালীর কাছে কৃপা ভিক্ষা করছিল। প্রত্যুষের আধা অন্ধকারে রাজার মুখের দিকে চায়নি।

অথচ এটা যে বিরাট এক ভোজবাজি হয়ে গেল ওরা টের পেল কিছু পরে মাটি থেকে মাথা তুলে। সবিস্ময়ে দেখে তাদের রাজা চিতায়ই শুয়ে আছে—সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে মৃতাবস্থায়। তাহলে যাকে দেখলো সে কে?

ওরা জানতে পারলো না সে হল ফগ-এর ভৃত্য ফরাসী দেশীয় জঁা পাসেপার্তু। মনিবের আদেশে রাতের অন্ধকারে গিয়ে চিতায় শায়িত রাজার পোষাক খুলে নিয়ে নিজেই শুয়ে ছিল চিতায় রাজাকে আবৃত করে।

জনতা যখন এই প্রবঞ্চনা টের পেয়ে হৈ হৈ করে দিকবিদিকে ছুটলো তখন আসল লোকেরা হাতির পিঠে চড়ে বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছে।

শুশ্রূসা করে মেয়েটির জ্ঞান ফেরালো ওবা। এলাহাবাদ পৌঁছে মেয়েটির জন্য নতুন জামা-কাপড় কেনা হল।

পার্শী ছেলেটিকে মহামূল্য দিয়ে কেনা হাতিটি পুরস্কার স্বরূপ দিয়ে দেওয়া হল।

পার্শী ছেলেটির আনন্দে চোখে জল এল। সে সানন্দে বিদায় নিল সাহেবদের কাছ থেকে।

ট্রেন চললো কলকাতার পথে। আউদা মেয়েটির বিস্ময়ের সীমা নেই। তাকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে যারা বাঁচিয়েছে সেই সাহেবদের প্রতি তার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। এরা উদার হৃদয় দেবতা।

মেয়েটি ইংরেজি শিক্ষিতা এবং খুব মার্জিত। ফগ বললো, শুনলাম এখানে থাকলে ওরা ফের তোমাকে ধরে অকথ্য নির্যাতন

করে মেরে ফেলবে। তার চেয়ে চলো আমার সঙ্গে, আমি হংকং যাব কলকাতা থেকে।

মেয়েটি রাজী। তার এক কাকা সেখানে বাস করেন। ধনী ব্যবসায়ী তিনি। সেখানে গিয়ে অনায়াসে উঠতে পারবে।

বেনারসে নেমে গেলেন সেনাপতি স্যার ফ্রান্সিস। গাড়ি চলেছে। কত বস্তু পার হয়ে গেল, চুনার ফোর্ট, লর্ড কর্ণওয়ালিসের কবর, বকসার, পাটনা। অবশেষে বর্ধমান, হুগলী, চন্দননগর পার হয়ে কলকাতা। সেদিন তারিখ ছিল ২৫ শে অক্টোবর। নির্দিষ্ট তারিখ।

বেলা বারোটায় ছাড়বে 'রেঙ্গুন' নামক জাহাজ হংকং-এর উদ্দেশ্যে। এমন সময় কল্পনাতীত ঝামেলা এসে উপস্থিত। পুলিশ এসে মনিব-ভৃত্য ও মেয়েটিকে নিয়ে চলে গেল আদালতে। ওদের বিরুদ্ধে কেস রয়েছে। প্রথমে মনে হল আউদাকে ছিনিয়ে আনারই কেস। কিন্তু আদালতে দেখা গেল বোম্বাইয়ে জুতোসুদ্ধ মন্দিরে ঢোকবার অপরাধে পাসেপার্তুর বিরুদ্ধে তিনজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত অভিযোগ করেছে। জজ পরধর্ম অবমাননার অভিযোগে পাসেপার্তুর চোদ্দ দিন জেল ও তিনশ পাউণ্ড জরিমানা। আর ফগ-এর ভৃত্যকে প্রশ্রয় দেবার অপরাধে আট দিনের জেল ও দেড়শ টাকা জরিমানা।

সর্বনাশ। যাত্রার তো সাংঘাতিক বিঘ্ন হবে। বিশ্ব পরিক্রমার বারোটা বেজে যাবে। বিশ হাজার পাউণ্ড বাজি হারতে হবে।

একটি কৌশল করল ফগ। জজকে জানালে তারা আপীল করবে জামিন চাই। দু'হাজার পাউণ্ড দিয়ে ওরা বেরিয়ে ঘোড়ার গাড়ি করে সোজা ডক্-এর দিকে চলে গেল। জাহাজে উঠে এ দেশ থেকে পালানো যাক তো!

পেছনে ধাবমান একটি লোককে দেখা গেল। ওরা দেখেনি। কিন্তু সে হল ডিটেকটিভ ফিক্স। বোম্বাই থেকে মন্দিরের পুরোহিতদের ঘুষ দিয়ে সে এই মামলা সাজিয়ে তাদের সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় এসেছে।

তারই চক্রান্তে এই ভোগান্তি। কিন্তু চিড়িয়া তো হংকং পালাচ্ছে। ঠিক আছে, সেখানেও ওদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে। কেননা সেটাও ইংরেজ অধীন বন্দর। ফিক্স নিজমনে এই সান্ত্বনা দিয়ে একটু স্বস্তি পেল।

তবে মনটা খারাপ হয়ে গেল এই ভেবে যে, টাকাটা যেভাবে দু'হাতে খরচা করে চলেছে, শেষ পর্যন্ত হাতে কিছু থাকলে হয়। বামালই যদি না পাওয়া গেল তো তার কমিশনের দফা রফা।

'রেঙ্গুন' জাহাজ চললো বঙ্গোপসাগর দিয়ে। পার হল আন্দামান দ্বীপ। বর্বর পাপুয়ান নামক উপজাতি অধ্যুষিত এই প্রখ্যাত দ্বীপ। চব্বিশ শো ফুট উঁচু পর্বত দেখা যায়। তীরের কাছে গাছে গাছে বাবুই পাখীর বাসা। এ বাসা হল চীনদেশের মানুষদের প্রিয় খাদ্য-বিশেষ।

ঐ জাহাজে লুকিয়ে চলেছে ডিটেকটিভ ফিক্সও। শেষ চেষ্টা যদি ওয়ারেণ্ট গিয়ে হংকং পৌঁছয় তাহলে ব্যাঙ্ক-ডাকাতটাকে ধরা যেতে পারে।

মহা মুস্কিল হয়েছে ডিটেকটিভের সুয়েজ থেকে বোম্বাই সেখান থেকে কলকাতা কোথাও পরোয়ানার অভাবে ফগকে আটকানো যাচ্ছে না।

একটা মতলব মাথায় এল। ওর চাকরটার কাছে মনিবের দস্যুতার কথা প্রকাশ করে দলে টানতে পারলে কাজ হবে। হংকং-এ যদি কোন রকমে ওদের স্টিমার ফেল করিয়ে দেওয়া যায় তাহলে হাতে আট দিন সময় পাওয়া যাবে। তার মধ্যে অবশ্যই ওয়ারেণ্ট এসে পড়বে লণ্ডন থেকে।

ডেক-এ ফিক্স সাক্ষাৎ করল পাসেপার্তু'র সঙ্গে। আরে আপনি আবার চলেছেন হংকং? ব্যাপার কি? আরে ভাই আমার মালিকের মর্জিমত চলেছি।

নানা কথাবার্তা আলোচনায় পাসেপার্তু'র সন্দেহ হল যে, লোকটা হল রিফর্ম ক্লাবের ফগের তাস্‌ড়ে বন্ধুদের চর।

পাসেপার্তুর মুখে আউদা উদ্ধারের ইতিহাস শুনে ডিটেকটিভ ফিক্স যেন কিঞ্চিৎ দমে গেল। ডাকাতের এত দয়া। কি জানি বাবা এ আবার কি খেল।

চীন সমুদ্রে পড়ে জাহাজ বড় টালমাটাল হল। যথা সময়ে হংকং হয়ত পৌঁছনো যাবে না। তার মানে ইয়োকোহামার জাহাজ ফেল তথা বিশ্ব পরিক্রমার আশা খতম।

ওদের সর্বনাশ, ডিটেকটিভের বুঝি পৌষ মাস। ৫ই তারিখে জাহাজ ছাড়বে হংকং থেকে। ওরা এসে পৌঁছলো ৬ই সকালে। জাহাজ অবশ্যই ছেড়ে গেছে। কিন্তু না, বরাত ভাল, জাহাজের বয়লারে গোলমাল দেখা দেওয়াতে দু'দিন দেরী হল। অর্থাৎ ৭ তারিখ সকালে ছাডবে। যাক বাবা হাতে এক দিন সময় পাওয়া গেল। তা হোক এখান থেকে ইয়োকোহামা পর্যন্ত দীর্ঘ পথে যদি একদিন বাঁচানো যায় তাহলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

আউদার কাকার খোঁজ কবা হল প্রথমে। নাম তার জিজি। খোঁজ করে হতাশ হল ওরা, দু'বছর আগে তিনি হল্যাণ্ড চলে গেছেন।

আউদা মহা বিপদে পড়ল। চোখে এল জল। ফগ তাকে জানালো ভেবো না তোমাকে আমার সঙ্গে ইয়োরোপ নিয়ে যাব।

ফিক্স সংবাদ পেয়েছে পাসেপার্তু তিনখানা টিকিট কিনতে গেছে জাহাজের। সে গিয়ে বন্দরে ওব সঙ্গে দেখা করে জানলো জাহাজ নাকি মেরামত ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। কাল সকালে নয় আজ অর্থাৎ ৬ই রাত্রিতেই ছাড়বে।

ফিক্স লোভী ভৃত্যকে মদ্যপান করাবার লোভ দেখিয়ে নিয়ে গেল এক আড্ডায়। সেখানে আফিমও চলে, মদও চলে। মাতাল করে যেই বলেছে ওর মনিব ফগ একজন ব্যাঙ্ক ডাকাত, অমনি পাসেপার্তু ঝাঁপিয়ে পড়েছে ফিক্সের গায়ে আক্রমণের উদ্দেশ্যে। সামলে নিয়ে ফিক্স ওকে মদের সঙ্গে আফিম মিশিয়ে বেহুঁশ করে ফেললো।

এদিকে ফগ মহা চিন্তায় পড়লো। টিকিট নিয়ে কেন ফিরে

আসছে না পাসেপার্তু। সন্ধ্যা গেল রাত্রি হল। মহা দুশ্চিন্তায় পড়লো।

সকালে আউদাকে নিয়ে জাহাজঘাটায় গিয়ে শুনলো আরেক দুঃসংবাদ। ইয়োকোহামাগামী জাহাজ কর্ণাটক গত রাত্রেই ছেড়ে চলে গেছে।

বাঃ চমৎকার। গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ফগ। সেখানে দেখা ফিক্সের সঙ্গে। ডিটেকটিভকে ফগ চেনে না। আলাপ হল। এ ভদ্রলোকও নাকি ইয়োকোহামা যাবে, কিন্তু উপায় ?

অথচ ফিলিয়াস ফগ-এর যে করেই হোক ইয়োকোহামায় যেতেই হবে, নয়ত বাজি হেরে যাবে। সে কথা কল্পনা করাও যায় না। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

অবশেষে বহু টাকা কবুল করে একটি দিশি পালতোলা বোট ভাড়া নিয়ে চললো ওরা। তবে ইয়োকোহামায় নয়। আটশো মাইল দূরত্বের সাংহাই বন্দরে। এখানে থেকেই আমেরিকা যাবার জাহাজ ছাড়ে। অতএব সে জাহাজ অনায়াসে ধরিয়ে দিতে পারবে, এই বলে আশ্বাস দিল বোটের মালিক।

নৌকো চললো। ফগের মনটা খারাপ, বেচারা পাসেপার্তুর কি হল কে জানে। প্রাণে বেঁচে আছে তো ? ফিক্স যাচ্ছে সঙ্গে। উপায় নেই বলেই যাচ্ছে। জাপানে গ্রেপ্তার চলবে না, আমেরিকায়ও তাই। সেই লণ্ডনে যদি ফেরে তখন ধরতে হবে ডাকাতটাকে।

বোটেও বহু ঝড়-ঝাপটা জীবন সংশয় হবার পর তবে গিয়ে পৌঁছলো সাংহাই বন্দরে। ভয়ংকর টাইফুনের পাল্লায় পড়েছিল ক্ষুদ্র কুড়ি টনের বোট। চারজন মাল্লা ও স্বয়ং ফগ মিলে সামাল সামাল করে নৌকো বাঁচিয়ে দুস্তর সমুদ্র পেরিয়েছে।

সাংহাই থেকে আমেরিকা যাবার জাহাজ 'জেনারেল গ্র্যাণ্ট'-এ উঠেছে ওরা।

ইয়োকোহামায় এসে এক চমক খেলেন ফিলিয়াস ফগ।

আউদাকে নিয়ে এক সার্কাস দেখতে গেছেন। দীর্ঘনাসার কসরৎ দেখাচ্ছে কতগুলো খেলোয়াড়। তার একজন কাছে এগিয়ে এল। আরে এ যে জঁা পাসেপার্তু। এ কি স্বপ্ন না সত্যি?

সবিস্তারে পরে শোনা গেল সব কাহিনী। মদ ও আফিমের আড্ডায় বিকেলে জ্ঞান ফিরতে সে সোজা এসে কর্ণাটক জাহাজে ওঠে। তার মনেই ছিল না যে জাহাজ আগের দিন ছাড়বে একথা মনিব জানেন না। ইয়োকোহামায় এসে আরেক বিপদ। পকেটে কোন পয়সা নেই। মদ ও আফিমের আড্ডায় চোরেরা সব নিয়ে নিয়েছে। এখন উপায়। নিজের ভাল জামা পোষাক বিক্রি করে তবে ক্ষুধা মেটালো। তারপর এই সার্কাসের দলে ভীড়ে গেল। প্রথম জীবনে দেশে সে সার্কাস খেলা দেখাতো। তাই অসুবিধে হল না। ভাগ্যিস সার্কাসে ঢুকেছিল তাই না পুনর্মিলন হল।

জেনারেল গ্রাণ্ট আমেরিকার পথে যাত্রা করল। জাহাজে খুঁজে খুঁজে বার করল ফিক্সকে। প্রচণ্ড ক্রোধে পাসেপার্তু মারাত্মক এক ঘুষি চালালো ডিটেকটিভকে লক্ষ্য করে। জখম হয়েও কিন্তু রেগে গেল না চতুর ফিক্স। নির্লজ্জের মত হাসতে লাগলো। ইচ্ছে করল ব্যাটাকে খুন করে ফেলে কিন্তু স্পৃহা চেপে গেল ভৃত্যটি।

সানফ্রানসিস্‌কো। ৩রা ডিসেম্বর জাহাজ ভিড়লো এবারে প্যাসিফিক রেল রোড দিয়ে নিউইয়র্ক যেতে লাগবে ৭ দিন। বাকি ১১ দিনে লণ্ডন অবশ্যই পৌঁছে যাবে। সুতরাং ৮০ দিনে ভূঃপ্রদক্ষিণে আর কোন অসুবিধা নেই। উৎফুল্ল হয়ে উঠল ফিলিয়াস ফগ।

বাধার পর বাধা। রেল পথের মধ্যে বিপদ। রকি পর্বতের ভেতর দিয়ে রেল যেতে যেতে সহসা থেমে গেল। কি হল? সামনে দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বিরাট খাদ। তার উপর রয়েছে একটা ব্রিজ। সেটা নাকি নড়বড়ে হয়ে গেছে। তার উপর দিয়ে গাড়ি চলবে না। গাড়ি গেলে ব্রীজ ভেঙ্গে রেল কয়েক হাজার ফুট খাদে পড়ে চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাবে। হায় হায়। এখন কি হবে।

গাড়ি ভর্তি যাত্রী সবাই গাড়ি ঐ ব্রীজের উপর দিয়েই চালিয়ে নিতে বললো। ড্রাইভার ভয় পায়। তখন মরিয়া হয়ে যাত্রীদের উপরোধে পড়ে ড্রাইভার রেলকে পেছন দিকে মাইল খানেক নিয়ে গেল। তারপর সামনে চালাল ভীষণ স্পীডে।

শোঁ শোঁ করে রেল এসে নড়বড়ে ব্রীজে উঠে পার হয়ে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই দেখা গেল ব্রীজটা ভেঙ্গে অতল গহ্বর খাদে পড়ে গেল।

শিউরে উঠল রেলভর্তি যাত্রীরা। উঃ ঈশ্বর সহায়। না হলে এমন বিপদ থেকে কেউ বাঁচে।

বিপদ যখন আসে একা আসে না। তাই হল এক্ষেত্রে। ভাঙা ব্রীজ পার হয়ে রেল গাড়ি চললো। এবার সে যাচ্ছে রেড ইণ্ডিয়ান অধ্যুষিত এলাকা দিয়ে। এরা দস্যু। প্রায়শই ট্রেন আক্রমণ করে খুন-জখম, লুঠতরাজ করে তছনচ করে দেয়।

সহসা একদল রেড ইণ্ডিয়ান চলন্ত গাড়িতে উঠে আক্রমণ করল। প্রথম গুলি করল ড্রাইভারকে। ব্যস্ চালকহীন অবস্থায় গাড়ি চলতে লাগলো ভীষণ গতিতে।

রেড ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়ে গেল যাত্রীদের। ফগ, পাসেপার্তু, ডিটেকটিভ এমন কি মেয়েটিও গুলি চালাতে লাগলো।

কিন্তু চালকহীন গাড়ি যদি সামনেকার কিয়ার্নি নামক কেল্লা স্টেশন এই ভাবে পার হয়ে যায় তাহলে গিয়ে পড়বে পুরোপুরি রেড ইণ্ডিয়ানদের কট্টর রাজ্যে। সবাইকে কেটে কচু কাটা করে ছাড়বে তাহলে।

এখন উপায়? উপায় হল যে কোন ভাবে গাড়ি কিয়ার্নির আগে থামানো। সারাটা গাড়িতে লম্বা-লম্বি করিডোর বারান্দা রয়েছে।

পাসেপার্তু জীবন বিপন্ন করে এগিয়ে গেল গাড়ি থামাতে।

বাইরে তুষার ঝড়। চোখ চাওয়া যায় না। শীতে হাড় কনকন করে। তার মধ্যে পাসেপার্তু যা করল তার তুলনা হয় না।

চলন্ত গাড়ির দোলানি উপেক্ষা করে সে গিয়ে ইঞ্জিন ও শেষ বগির সংযোগদণ্ড বাফারের উপর লাফ দিয়ে পড়ে অবিশ্বাস্য ভাবে ব্যালান্স রেখে বাফারের সঙ্গে যুক্ত শেকল উন্মুক্ত করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগামী ইঞ্জিন মূল গাড়িকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলে গেল। আর যাত্রী বোঝাই কামরা সমূহ ক্রমশ মন্দগতি হয়ে এক সময় প্রায় কিয়ার্নি কেল্লা স্টেশনের কাছেই থেমে পড়ল।

কিন্তু আফশোষ, এই মহৎ কাজটি করে পাসেপার্তু শেষ সময়ে ব্যালান্স হারিয়ে রেল লাইনের পাশে পড়েছিল অচেতন হয়ে।

ফগ ভৃত্যকে না পেয়ে তক্ষুনি আউদাকে ঐ ডিটেকটিভ ফিক্সের কাছে ওয়েটিং রুমে রেখে, স্টেশনের সৈন্য কিছু নিয়ে হিংস্র বন্যজন্তু ও শ্বাপদসংকুল অরণ্যভূমির দিকে খুঁজতে বের হল। ভৃত্য এবং আরও দু'জন যাত্রী নিখোঁজ হয়েছে।

দিন গেল রাত গেল ফগ-রা কেউ ফিরল না। দুশ্চিন্তায় আউদার চোখে এল জল। সে কাঁদতে লাগলো।

পরদিন সকালে চলে যাওয়া ইঞ্জিন ফিরে এল। ড্রাইভার মরেনি আহত হয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে পড়েছিল। জ্ঞান হতে ব্যাক করে চলে এসেছে!

গাড়ি ওদের না নিয়ে চলে গেল। আউদা বা ফিক্সও যেতে পারল না কেননা ফগ ফিরে আসেনি। ইতিমধ্যে স্থানীয় একটি লোক এসে একটি পরিকল্পনা দিয়ে গেল ফিক্সকে।

সন্ধ্যার মুখে ফিরে এল বিজয়ী ফগ। তিন জন যাত্রীকেই উদ্ধার করে ফিরে এসেছে। কিন্তু হায়, যাবে কি ভাবে। ট্রেন তো চলে গেছে। তিন দিনের মধ্যে এ লাইনে আর কোন গাড়ি নেই।

এবারে ফিক্স সেই স্থানীয় লোকটির প্রস্তাবের কথা বললো। লোকটির একটি স্লেজগাড়ি আছে। তার মাস্তুলে পাল তুলে দিলে

অনুকূল বাতাসে পঞ্চাশ মাইল ঘণ্টায় বরফের উপর দিয়ে ছুটে যেতে সক্ষম।

এখানকার সারাটা প্রান্তর ও হ্রদ বরফে ঢাকা। দুশো মাইল দূরের ওমাহা স্টেশনে চার ঘণ্টায় সে পৌঁছে দিতে সক্ষম বলে জানায় স্লেজগাড়ির মালিক মাজ। বরফাচ্ছন্ন অঞ্চলকে প্রেইরী বলে।

ওরা শ্লেজগাড়িতে কনকনে শীতের মধ্যে রওনা হয়ে গেল। তীর-বেগে চললো স্লেজ পালের হাওয়ায়। ওমাহায় দুপুরে পৌঁছে সেখান থেকে ট্রেনে প্রায় নয়শো মাইল দূরের নিউইয়র্ক শহরে গিয়ে উপনীত হল।

রাত নটা পঁয়ত্রিশ ১১ই ডিসেম্বর পৌঁছলো নিউইয়র্ক। কিন্তু এ আফশোসের কি সীমা আছে। এখান থেকে মাত্র আধ ঘণ্টা আগে 'চায়ণা' নামক জাহাজ বন্দর ছেড়ে রওনা হয়ে গিয়েছে। হা হতোস্মি। একেই বলে বুঝি ঘাটে এসে তরী ডোবা। না হলে শেষ পর্যায়ে এসে কি এই বিপর্যয়।

ফিলিয়াস ফগ চিরকালই অচঞ্চল। ভেতরে কি হচ্ছে বোঝাই গেল না কিন্তু বাহ্যিক চেহারায় পরম শান্তি যেন বিরাজ করতে লাগলো।

দমবার পাত্রও সে নয়। ডকে ঘুরে ঘুরে অন্য জাহাজ পায় কিনা সে চেষ্টা করতে লাগলো। উহুঁ কোন আশা নেই। কেউ যাবে পরশু, কেউ তরশু, কেউ ছেড়ে গেছে।

কিছু পাল তোলা জাহাজ ছাড়ছে বটে কিন্তু তাতে লাভ হবে না। তারা আটলান্টিক পেরুতে বহুদিন সময় নেবে।

অবশেষে একটি জাহাজের সন্ধান পাওয়া গেল। নাম 'হেনরিয়েটা'। যাবে বোর্দো।

ক্যাপ্টেন ও মালিকের নাম আনড্রু স্পিডি। অত্যন্ত ত্যাঁদোড়, একগুঁয়ে এবং বদমেজাজী লোক। কিছুতেই লিভারপুল যেতে রাজী হল না।

অগত্যা ফিলিয়াস ফগ জানালো তারা চারজন বোর্ডোই যাবে। মাথাপিছু দু'হাজার ডলার দেবে ভাড়া। পাষাণ গললো। জাহাজ ছাড়লো।

মাঝসমুদ্রে দেখা গেল ফিলিয়াস ফগই জাহাজ চালাচ্ছে ক্যাপ্টেন বনে গিয়ে। কি ব্যাপার? না অজস্র টাকা ছড়িয়ে জাহাজের তাবৎ নাবিক ও অফিসারদের কিনে নিয়ে আসল ক্যাপ্টেন স্পিডিকে তার কেবিনে তালাবদ্ধ করে জাহাজকে লিভারপুলের পথে নিয়ে চলেছে। স্পিডি লোকটা বন্দী হয়ে যাচ্ছেতাই খিস্তি খেউর তর্জন গর্জন করে বাপান্ত করছে ওদের।

কোন কাজই তো ফগ-এর বিনা বিঘ্নে হবার নয়। এক সময় ইঞ্জিনিয়র বললে মাত্র দু'দিনের কয়লা আছে। এর কারণ হল দুটো। এক-দুদিন আগে ভয়ানক ঝড়ে পড়ে পাল্ বন্ধ রেখে সমানে কয়লা খরচা করে স্টিম করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত স্পিডি বেশী স্টিম চালাত না বলে কয়লা তুলতো কম। পালেই চলত বেশী।

মুস্কিল। দু'দিন মাত্র চলবে কয়লা। এখনো তো লিভারপুল অনেক দূরের পথ। এর পর ফগ যা করল তা বুঝি ফগ-এর পক্ষেই সম্ভব। পাগলা স্পিডির কাছ থেকে ষাট হাজার ডলারে জাহাজটা কিনে নিল। তাও খোলটা নয়। ওপরের কাঠের অংশটা। কেন কিনলো? কিনলো ঐ কাঠ ও যাবতীয় কাঠের আসবাব চিরে চিরে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হবে কয়লার বদলে। স্টিম্ চাই। নয়ত বাজি জেতা যাবে না।

তাই হল, স্টিমেই চললো 'হেনরিয়েটা'।

২০শে ডিসেম্বর আয়ারল্যাণ্ড দৃষ্টিপথে পড়ল। রাত দশটা। বাজি জেতবার আর ২৪ ঘণ্টা মাত্র সময় রয়েছে। সামনে কুইন্স-টাউন। লিভারপুল জলপথে পৌঁছতে ২৪ ঘণ্টা লাগবে। তাতে তো চলবে না।

সমস্ত ভৌগোলিক পথ বুঝি ফগ-এর নখদর্পণে। সে স্থির করল

কুইন্স-টাউনে নেমে ট্রেনে ডাবলিন হয়ে ডাক-ষ্টিমারে পার হয়ে লিভারপুল যাবে। তাতে সময় লাগবে মাত্র ১২ ঘণ্টা।

২১শে ডিসেম্বর লিভারপুল। লণ্ডন যেতে ঘণ্টা কয়েক লাগবে মাত্র। হে ঈশ্বর তুমি সহায়, বাজি অবশ্যই জিতে গেল সে।

এমন সময় বজ্রাঘাত। সেই সুয়েজ থেকে অনুসরণকারী ডিটেকটিভ ফিক্স ওয়ারেন্ট নিয়ে ফিলিয়াস ফগকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল ডাকাতির অপরাধে। হয়ে গেল বাজি জেতা। হা হতোস্মি। কপালে নেই বিশ হাজার পাউণ্ড।

একটা ঘরে আবদ্ধ করে ফিক্স বোধকরি ওকে লণ্ডন নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে গেল। রাত হল। গভীর রাত শেষে ঢং ঢং ঢং তিনটে বাজলো। সহসা দরজা খুলে হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকলো ফিক্স।

অত্যন্ত দুঃখিত এবং লজ্জিত। আপনি মুক্ত। ব্যাঙ্ক ডাকাতির আসল আসামী এডিনবরায় ধরা পড়েছে দিন তিনেক আগে। আপনার চেহারার সঙ্গে তার ভীষণ মিল ছিল। ক্ষমা করবেন।

ফগের হাতের এক ঘুষিতে ধরাশায়ী হল ডিটেকটিভ। পয়সা ঘুষ দিয়ে স্পেশাল ট্রেনে করে লণ্ডন পৌছতেও পাঁচ মিনিট লেট হয়ে গেল। নটা বাজতে দশ, তখন রাত।

হতাশার ক্লান্তি ফুটে উঠেছে ফিলিয়াস ফগের মুখে চোখে। এত দীর্ঘ পথ। ক্লান্তিকর ভ্রমণ। প্রচুর খরচান্ত। হিসেব করে তো চক্ষুস্থির। হাতে-পাতে কিছু নেই।

আউদাকে ডেকে করুণ ভাবে নিজের দুরবস্থার কথা জানালো ফগ। সে এখন প্রায় ভিখিরী। ভেবেছিল আউদাকে এখানে এনে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে। তখন ধারণা ছিল সে বাজি জিতবে। সে হবে ধনী। কিন্তু বিধি বাম। সবই বিফল হল। সে পাঁচ মিনিটের জন্য পরাজিত হল।

শুনে আউদার সমবেদনায় চোখ সজল হল। সহসা সে একটি মধুর প্রস্তাব করল।

—আমায় আপনি বিয়ে করুন।

—অ্যাঁ—আনন্দে ফগ-এর হাঁ বড় হয়ে উঠল। তিনি পাসেপার্তুকে পাঠালেন পাত্রী ঠিক করতে কালই বিয়ে হবে।

কিছুক্ষণ বাদে পাসেপার্তু খবর নিয়ে এল কাল বিয়ে হতে পারবে না কেননা কাল রবিবার।

—সে কি আজ তো রবিবার। গতকাল শনিবার ২১শে ডিসেম্বর ছিল ভুলে গেলে, কালতো আমি বাজি হেরে গেছি।

—না না স্যার আপনার ভুল। আজই ২১শে ডিসেম্বর। শিগ্‌গির চলুন। আর মাত্র দশ মিনিট সময় আছে বাজি জেতবার। চলুন চলুন।

দুজনে একশ পাউণ্ড বকশিসের লোভ দেখিয়ে একটি ট্যাক্সি করে যেন উড়ে চললো রিফর্ম ক্লাবের দিকে।

তারিখ ভুল হল কি করে?

এটা ভৌগোলিক অঙ্কের ব্যাপার। অবিরাম পূর্বদিকে যেতে যেতে প্রতি ডিগ্রীতে চার মিনিট করে বেঁচেছে ফিলিয়াস ফগ-এর। এখন ৩৬০ × ৪ মিঃ = ২৪ ঘণ্টা মানে একদিন বেঁচে গেছে ফগ-এর হিসেব থেকে। তাই এই ভুল। ফগ যাকে ভেবেছিলেন ২১শে আসলে সেটা ছিল ২০শে ডিসেম্বর।

ট্যাক্সি চলেছে ঝড়ের মত।

রিফর্ম ক্লাব। সভ্যরা ভেবে নিয়েছেন ফগ আসেনি। কেননা 'চায়না' জাহাজে আসবার কথা। তাতে সে আসেনি। অতএব বাজি তারা জিতে গেল। বেচারা ফগ কোথায় কে জানে।

আটটা তাম্বুড়ে বন্ধু ফ্লানাগান, ফালেন্টিন, সালিভান, ষ্টুয়ার্ট এরা ঘড়ির পানে চেয়ে আছে। আটটা পঁয়তাল্লিশে বাজির সময় শেষ হবে।

টিক্ টিক্ টিক্ ঘড়ি চলেছে।

আটটা চল্লিশ, বিয়াল্লিশ, চুয়াল্লিশ…পঁয়তাল্লিশ !!

সহসা দরজা ঠেলে প্রবেশ করলো মূর্তিমান ফিলিয়াস ফগ!

উল্লাসে চীৎকার করতে গিয়েও বিস্ময়ে হতবাক চার বন্ধু বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইল বাজি জেতা বাহাদুর পুরুষ ফিলিয়াস ফগ, যে এইমাত্র এক অসম্ভব কার্য সমাপ্ত করে এল। অর্থাৎ মাত্র ৮০ দিনে বিশ্ব পরিক্রমা করে এল।

নগদ বিশ হাজার পাউণ্ড জিতে নিল বাপকা বেটা।

ঘরে ঢুকে সহাস্যে ফগ বন্ধুদের অভিবাদন জানিয়ে বললে, বন্ধুগণ আমি ফিরে এসেছি।

বন্ধুরা তেমনি তাকিয়ে রইল বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টি নিয়ে।

আর কি। গল্প ফুরোলো। শুধু বলা বাকি যে দুদিন বাদেই রূপসী মেয়ে আউদার সঙ্গে বিজয়ী বীর ফগের বিবাহ মহাসমারোহে হয়ে গেল। তারপর সুখে শান্তিতে তারা ঘরকন্না করতে লাগলো।

সমাপ্ত